Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার ইতু

রোলঃ 228020531

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শারমিন আক্তার ইতু

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার ইতু

রোলঃ 228020531

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার ইতু, আইডিঃ 228020531 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ও আমাদের জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শারমিন আক্তার ইতু

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

শারমিন আক্তার ইতু

আইডিঃ 228020531

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সূচনা 5

ইসলাম কি 6

ইসলামী আকিদা 21

আখলাক 29

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন 39

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা 67

ইসলামী অর্থনীতি 69

ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন 72

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় কাজ 74

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের সর্দারের উপর এবং তার পরিবারবর্গ এবং সকল সাথগণের উপর।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এর কাছে শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের
একটি পূর্ণাঙ্গ দীন ও জীবনবিধান দান করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদের তা শিখিয়েছেন।
আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। পবিত্র কোরআনে বর্নিত হয়েছে-

" নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলাম "
(সূরা : আর ইমরান -১৯)

১৪০০ বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার প্রিয় হাবিব ,খাতামুল আম্বিয়া ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন ইসলামের দাওয়াত দিতে। তার এই দাওয়াত দিকে দিকে ছড়িয়ে পরেছে। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন,অর্থনীতি , চিকিৎসা শাস্ত্র সকল স্থানে ইসলামের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব শিখিয়ে গেছেন।। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্থানে ইসলামের গুরুত্ব কতটুকু সেই বিষয়ে কিছু কথা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।।।।।।।
ভুল ত্রুটি হলে আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দিবেন।

ইসলাম কি

ইসলাম আরবি শব্দ। মূল ধাতু " সিলমুন "থেকে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। কোন অভিধান কারের মতে ইসলামের শাব্দিক অর্থ শান্তি ও আত্মসমর্পণ।

কোন কোন অভিধান কার বলেছেন, ইসলাম শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে আছে অনুগত হওয়া বা আনুগত্য করা, মেনে নেওয়া, বিনম্র হওয়া এবং সমর্পণ ইত্যাদি।
ইসলামে সংজ্ঞা বা পরিচয় এর বিষয়টি সবচেয়ে সহজ ভাবে বিখ্যাত হাদিসে জিব্রাইল থেকে পাওয়া যায়।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সহাবাদের) বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। কিন্তু লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে সংকোচবোধ করল। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে হাঁটুর কাছে বসে বললোঃ হে আল্লাহর রসূল! 'ইসলাম' কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করবে না, সলাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং রমাযানের সওম পালন করবে।" সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! 'ঈমান' কি? তিনি বললেন, 'তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাব, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান রাখবে এবং তাকদীরের উপরও পূর্ণ ঈমান রাখবে।' সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! 'ইহসান' কি? তিনি বললেন, "তুমি এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখো, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করো"। সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামাত কখন হবে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জানে না। তবে আমি তার নিদর্শন ও লক্ষণসমূহ তোমাকে বলে দিচ্ছিঃ "যখন তুমি দেখবে কোন নারী তার মনিবকে প্রসব করবে' এটা কিয়ামাতের একটি নিদর্শন। যখন তুমি দেখবে, জুতাবিহীন, বস্ত্রহীন, বধির ও বোবা পৃথিবীতে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এটা একটি নিদর্শন। আর যখন তুমি দেখবে মেষ চালকরা সুউচ্চ দালান-কোঠা নিয়ে গর্ব করছে, এটাও কিয়ামাতের একটি

নিদর্শন। যে পাঁচটি অদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, কিয়ামাতের জ্ঞান তাঁরই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত পাঠ করলেন, “অবশ্যই আল্লাহর নিকটই কিয়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মাতৃগর্ভে কী আছে তা তিনিই জানেন। কোন জীবই আগামীকাল কী উপার্জন করবে তা জানে না এবং কোন স্থানে সে মরবে তাও জানেনা”-(সূরাহ লুক্‌মান ৩১ : ৩৪) তিনি সূরাহর শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। এরপর লোকটি চলে গেলো। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সহাবাদের বললেন, তোমরা লোকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অথচ অনেক খোঁজা-খুজি করা হলো কিন্তু তাঁরা তাকে আর পেলো না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইনি জিবরীল (‘আঃ) তোমরা প্রশ্ন না করায় তিনি চাইলেন যেন তোমরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর। (ই.ফা. ৭; ই.সে. ৭)

(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)

ইবন ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি।
১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ও
২. সলাত কায়িম করা।
৩. যাকাত আদায় করা।
৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং
৫. রমযানের সিয়ামব্রত পালন করা (রোজা রাখা)।

(৪৫১৪; মুসলিম ১/৫ হাঃ ১৬, আহমাদ ৬০২২, ৬৩০৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৭, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৭)

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)

কালিমা তাইয়্যিবাহ

لا اله الا الله محمد رسول الله

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগীর উপযুক্ত কেউ নেই) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রেরিত রাসুল।

এই কালিমাই হল ইসলামের প্রথম রোকন বা স্তম্ভ। এটাই হলো ঈমানের মূল ভিত্তি। এই কালিমাতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত রিসালাতের স্বীকারোক্তি রয়েছে। কেউ যদি কালিমা পাঠ করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না করে তাহলে সে মুসলমান হবে না। তাই মুখে স্বীকার করার সাথে সাথে অন্তরেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে ও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। আমরা তাই কালিমার মর্ম বোঝার চেষ্টা করব পবিত্র কালিমার দুটি অংশ রয়েছে।

1. **প্রথম অংশ**-

لا اله الا الله

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই
এতে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদ এর ঘোষণা করা আহয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই পালনকর্তা, তিনি জীবিকা দানকারী। তিনি মৃত্যুদাতা , তিনি জীবন দাতা। সুস্থতা - অসুস্থতা, দারিদ্রতা - সচ্ছলতা, ভালো-মন্দ, কল্যাণ - অকল্যাণ সবকিছুর মালিক একমাত্র তিনিই।
আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কুরআনে ৫১টি জায়গায় চার একাত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক।
(বাকারা ২:২৫৫)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।
(আল-ইমরান ৩:২)

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ভাষণ। আর এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আর আল্লাহ; তিনিই হলেন পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ।

(আল-ইমরান ৩:৬২)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদিস-তিনি ইরশাদ করেছেন__ "ঈমানের সত্তরোর্ধ্ব শাখা রয়েছে। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও উন্নত শাখা হল__'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'__এর স্বীকারোক্তি"

(বুখারী ,মুসলিম)

এজন্যই জিকির সমূহের মধ্যে উত্তম হল__ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ "জিকির।

হজরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খালেস অন্তরে একনিষ্ঠতার সঙ্গে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনোদে আহমদ)

যে ব্যক্তি সবসময় লা ইলাহা ইল্লাহর জিকির করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু নসিব করবেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র জিকির করার মাধ্যমে মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব এবং জান্নাত লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

محمد رسول الله2. দ্বিতীয় অংশ:

' মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ' ।

এতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের ঘোষণা করা হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসুল হওয়ার অর্থ হল আল্লাহ তাকে হিদায়াত বা পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদের পথ নির্দেশক এবং তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য এবং আমাদের তা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হবে। তিনি যা আদেশ দিয়েছেন আমরা তা পালন করব আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবো । মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আখেরি রাসূল অর্থাৎ তারপরে আর কোনো নবী রাসূল পৃথিবীতে আসবেনা , আমাদের এটাও বিশ্বাস করতে হবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল কোরআন নাজিল করা হয়েছে। এই কোরআনের প্রতিটি বাণী এবং শিক্ষা তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন।।

অর্থাৎ আমরা যখন কালিমা পাঠ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি তখন তার সকল আদেশ নিষেধ মানা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তাই রেখে যাওয়া শরীয়তের উপর আমাদের আমল করতে হবে।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।

(বাকারা ২: ১৫১)

তাই আমরা আমাদের জবানে বেশি ব শো েশি কালিমার জিকির জারি রাখবো এবং সেই অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

নামায

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভব মূল ভিত্তি হল সলাত অর্থাৎ নামায। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ফরজ ইবাদত হলো নামায। যা দিনে পাঁচবার আদায় করা হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা নামাজের বিষয়ে প্রায় ১২৬ টি আয়াত নাজিল করেছেন। এবং শত শত হাদিসে নামাজের ব্যাপারে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে

এটি ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। নামাজ ইসলামের বড় ধরনের একটি নিদর্শন। নামাজ হলো আসমানের সাথে জমিনের সম্পর্ক,বান্দ ার সাথে তার রবের সম্পর্ক । নামাজের মাধ্যমে বান্দা তার রবের সাথে দৈনিক পাঁচবার কথা বলে। বান্দা প্রতিদিন কয়েকবার বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে আল্লাহর ক্ষমতা ও রাজত্বের সামনে মাথা নত করে। নামাজকে আল্লাহ সুবাহানাত ালা তাঁর বান্দাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অনেক।

আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেছেন--

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

(লুকমান ৩১:১৭)

নামাজের একটি বিশেষ প্রভাব হল, যদি তা সঠিক পন্থায় আদায় করা যায়, আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখছে, এটা ভেবে একান্ত মনে খুশু খুজু সহকারে যদি তা আদায় করা হয়,তবে মানুষের অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। নামাজ ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করে দেয়। নামাজ বান্দার জীবনের দুঃখ-কষ্ট ,হতাশা দুরদশা, ভয়, সমস্যা দূর করে দেয়।

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন--

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।

(বাকারা ২:৪৫)

নামাজের বরকত

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করতে হয়। নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা

এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য ফরজ করেছেন। যে বান্দা পাঁচ বার আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়, তার গুণগান , হামদ-সানা পাঠ করে, তার প্রশংসা ও তার কাছে সাহায্য এবং সরল সঠিক পথের নির্দেশনা চেয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে তার মহত্ত্বের ঘোষণা দেয়, দুয়া করে সে বান্দা আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা মোহাব্বত, রহমত ও দয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বদৌলতে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সালাম বলেছেন

যে ব্যক্তি পাঁচটি নামাজ মুসল্লির সঙ্গে আদায় করবে, তা‘‘র সকল পাপ মাফ হয়ে ”যাবে, তবে বড় পাপ বাদে।

সহীহ মুসলিম)১১৫৯)

,নামাযীরা পাবে জান্নাতে সম্মানজনক আসন যারা নিজেদের সালাত হেফাযত করে“ ;(পরকালে) তারা (অতীব) মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।” (সূরা ৭০ মা'আরিজ ৩৪৩৫)।

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত :

নামাজের গুরুত্ব কতটুকু তা রাসুল সালাম এর হাদিস এবং আল্লাহ তাআলার কোরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নামাজকে তার বান্দার জন্য ফরজ করেছেন।ফরজ ইবাদত ছেড়ে দেওয়া কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নেই। কোনো মুমিন বিনা কারণে ফরজ ইবাদত ছেড়ে দিলে তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ কোরানে ইরশাদ করেছেন

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একদিকেই, যে দিকে সে মুখ করে (এবাদত করবে)। কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

(বাকারা ২:১৪৮)

নামাজ অন্তরের গুনাহ গুলোকে আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলে, পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। নামাজ বান্দাকে সবরকারী হতে শেখায়, শোকরগোজারি হতে শেখায় , আল্লাহর মুখাপেক্ষী হতে শেখায়। সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে নামাজের তাগিদ দিয়েছেন । নামাজের গুরুত্ব এতটাই যে কেউ যদি নামাজ পড়ার জন্য পানির অভাবে অজু করতে না পারে তাহলে তাকে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে হবে। কেউ যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারে তাহলে তাকে বসে নামাজ পড়তে হবে , বসে না পারলে শুয়ে নামাজ পড়তে হবে , যদি বেশি অসুস্থ থাকে তাহলে ইশারায় নামাজ পড়তে হবে কিন্তু নামাজ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এ থেকে বোঝা যায় যে নামাজের গুরুত্ব কতটুকু।

কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন

"নিঃসন্দেহে সালাত (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

(সূরা ২৯; আনকাবুত ৪৫)

সালাত হলো এক উত্তম যিকির।আর এর মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। “যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিকিরই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।”

(সূরা ১৩; রা’দ ২৮)

এ আমলের মধ্যে রুযী-রোজগারেরও প্রশস্ততা রয়েছে, যে প্রাপ্তি একেবারেই নগদ । “তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো।”

(সূরা ২০; ত্বা-হা ১৩২)

হাদিস শরীফে আছে

কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়। (মুসলিম: ২৩৩)

কোন মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা সালাত আদায় করে। তার পাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরে যায়। (সহীহ তারগীব: ৩৫৬

যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে।বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না। (সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম: ৪৮৮)।

সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর (অর্থাৎ নফল সালাত বেশি বেশি পড়)। (মুসলিম: ৪৮৯)।

যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।

জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় (বুখারী: ৬৪৭)। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। (বুখারী)

(নোট-www.hadithbd.com)

রোজা :

রোজা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ কাজ । আরবি রমাদন মাসে প্রাপ্ত নারী ও পুরুষের জন্য আল্লাহ তাআলা রোজা ফরজ করেছেন। রোজা হল নিয়াতের মাধ্যমে দিনভর পানাহার থেকে বিরত থাকা। রোজা একজন মুমিন বান্দার আত্মাকে পবিত্র করে এবং অনিষ্টতা থেকে মুক্ত করে নিরাপদ রাখে।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।"

(বাকারা ২:১৮৩)

যাকাত :

যাকাতের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া ,পবিত্র হওয়া।ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষায় ঋণ ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহরে পর বছরান্তে যদি কমপক্ষে সাড়ে সাত

ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

,কুরআনে আল্লাহ বলেছেন -

যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।
(বাকারা ২:৮৩)

যাকাত মানুষের সম্পদ কি পবিত্র করে ও বৃদ্ধি করে। এ বৃদ্ধি তিন ভাবে হয়:

1. যাকাত দাতার জন্য কল্যাণ
2. যাকাত গ্রহীতার জন্য কল্যাণ
3. যে সম্পদ থেকে যাকাত দেয়া হয় সেই সম্পদে কল্যাণ

এই তিন ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পায়। **১**

[**১** নোট: ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা -পৃষ্ঠা ২৪৫]

হজ্জ :

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের পঞ্চমটি হল হজ্বে বায়তুল্লাহ। ঈমান, নামায, যাকাত ও রোযার পরই হজ্বের অবস্থান। হজ্ব মূলত কায়িক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বিত একটি ইবাদত। তাই উভয় দিক থেকে সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর হজ্ব পালন করা ফরয। অর্থাৎ হজ্ব আদায়ে সক্ষম এমন শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচাপাতি ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত হজ্বে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্ব আদায়কালীন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহে সক্ষম এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্ব আদায় করা ফরয। হজ্ব প্রত্যেক মুসলমানের উপর সারা জীবনে একবারই ফরয হয়। একবার ফরয হজ্ব আদায়ের পর পরবর্তী হজ্বগুলো নফল

হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন----

" হে মানবসকল! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্ব করো। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছর কি হজ্ব করতে হবে? তিনি চুপ রইলেন এবং লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে তা (প্রতি বছর হজ্ব করা) ফরয হয়ে যেতো, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হতো না।"

(-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৩৭ (৪১২); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১০৬০৭; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৭০৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৫০৮; সুনানে নাসায়ী ৫/১১০; শরহে মুশকিলুল আছার, হাদীস : ১৪৭২; সুনানে দারাকুতনী ২/২৮১)

অন্য বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে।

," ইবনে আববাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ফরয হজ্ব আদায়ে তোমরা বিলম্ব করো না। কারণ তোমাদের কারো জানা নেই তোমাদের পরবর্তী জীবনে কী ঘটবে।" (-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৮৬৭; সুনানে কুবরা বায়হাকী ৪/৩৪০)

উপরন্তু একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা যে স্বচ্ছল সামর্থ্যবান ব্যক্তি সত্ত্বর হজ্ব আদায় করে না তাকে হতভাগা ও বঞ্চিত আখ্যায়িত করেছেন।

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন--

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার শরীরকে সুস্থ রাখলাম, তার রিযিক ও আয়-উপার্জনে প্রশস্ততা দান করলাম। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি সে আমার গৃহের হজ্বের উদ্দেশ্যে আগমন না করে তবে সে হতভাগ্য, বঞ্চিত।-

(সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৯৫; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস : ১০৩১; তবারানী, হাদীস : ৪৯০; সুনানে কুবরা বায়হাকী ৫/২৬২; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫২৫৯)

শুধু তাই নয়, একসময় বায়তুল্লাহ উঠিয়ে নেয়া হলে মানুষ হজ্ব করতে পারবে না এই আশঙ্কার কারণেও আল্লাহর রাসূল উম্মতকে তাড়াতাড়ি হজ্ব করার হুকুম করেছেন। ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন
তোমরা হজ্ব ও উমরার মাধ্যমে এই (বায়তুল্লাহ) গৃহের উপকার গ্রহণ কর। কেননা তা ইতিপূর্বে দু'বার ধ্বংস হয়েছে। তৃতীয়বারের পর উঠিয়ে নেওয়া হবে।-

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৫০৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৬৭১৮; মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৭২; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ১৬৫২)

[নোট :মাসিক আল কাউসার]

হজের বরকত ও ফজিলত:

অনেক হাদিসে হজ এবং হাজীদের সম্পর্কে বড়ই ফজিলত এর কথা বর্ণিত হয়েছে একটি হাদিসে এসেছে

"হজ ও ওমরা করার জন্য যারা আল্লাহর ঘরে যায় তারা আল্লাহর বিশেষ মেহমান। তারা যদি আল্লাহর দরবারে দোয়া কামনা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন , তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"

অন্য একটি হাদিসে এসেছে

"যে ব্যক্তি হজ করবে আর তার মধ্যে কোন অযথা বা অবৈধ কাজ করবে না আর আল্লাহর কোন নাফরমানি করবে না তবে সে গুনাহ থেকে এমন পরিষ্কার হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, যেমন সে জন্ম লগ্নে একদম বেগুনাহগার ছিল।

জীবন ব্যবস্থায় ইসলামের প্রয়োজনীয়তা :

ইসলাম শান্তির ধর্ম। পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা মনে করি যে শুধু ইসলামী নাম রাখা, মাঝে মাঝে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কোরবানির ঈদের সময় কোরবানি দেওয়াই ইসলাম, এ ধারণা ঠিক নয়।

ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, তাই জীবনের পরতে পরতে ইসলাম আছে। ইসলামকে শুধু কয়েকটি ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুযোগ নেই। জীবনকে পরিপূর্ণ ইসলামের নির্দেশনায় পরিচালনা করার নামই ইসলাম। এ জন্য মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উদ্দেশে বলেছেন, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ : নিজেকে পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবিষ্ট করতে হলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

আমাদের নবীজি (সা.)-পূর্ববর্তী সব নবীকে মহান আল্লাহ আত্মসমর্পণের আদেশ করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'বলুন, আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, এমতাবস্থায় আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ বাদ দিয়ে যাদের তোমরা আহ্বান করো। আর আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য।' (সুরা : মুমিন, আয়াত : ৬৬)

বিশুদ্ধ আকিদা : বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা, মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা, একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা, কুফর, বিদআত থেকে নিজেকে বিরত রাখা

পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবিষ্ট হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো। (সুরা : ত্বহা, আয়াত : ১৪)

উত্তম চরিত্র : ইসলাম উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়, পবিত্র কোরআনে নবীজি (সা.)-কে উদ্দেশ করে মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।’ (সুরা : কলম, আয়াত : ৪)

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি (সা.) বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলি পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠিয়েছেন। (শরহুস সুন্নাহ, মুসনাদে আহমদ)

এ জন্য ইসলাম মুমিনকে অন্যদের সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়। যেমন—সুরা বাকারায় বলা হয়েছে—‘আর মানুষকে উত্তম কথা বলো।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৮৩)

ইসলাম মানুষকে লজ্জাশীলতা ও পর্দার বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছে।
লেনদেন ও চুক্তিতে স্বচ্ছ থাকা : ইসলাম হালাল উপার্জন, বেচাকেনায় আমানত রক্ষা, ওয়াদা পালন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা ত্যাগের নির্দেশ দেয়। পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, সৎ আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ করার তাগিদ দেয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই ভাই।’

(সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কোরো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।’ (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ২)

ইসলাম কেবল নামাজ ,রোজা, হজ ,যাকাতের শিক্ষা দেয় নি। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে দুনিয়াতে আমাদের জীবন ব্যবস্থা কেমন হবে। জীবনের প্রতিটি স্থানে আমরা কিভাবে চলবো ,কি করব এবং কতটুকু করবো সেই শিক্ষা দিয়েছে । ইসলাম আমাদের অর্থনীতি ,সামাজিক ,পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিটি অবকাঠামোর শিক্ষা দিয়েছে। তাই বলা যায় ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আমাদের জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অতীব জরুরী।। আমরা যদি আমাদের জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি জায়গায় ইসলামের দিকনির্দেশনা গুলোকে অনুসরণ করতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে আমাদের সফলকাম করবেন ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী আকিদা

জীবনের প্রতিটি কাজ বিশ্বাসের উপর চলমান। বিশ্বাস এমন এক ভিত্তি যাকে অবলম্বন করে মানুষ তার সার্বিক জীবন পরিচালনার গতিপথ নির্ধারণ করে। মানুষটার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করে আকিদা বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। মানব জীবনের মূল চাবিকাঠি হল আকিদা বা বিশ্বাস। ভিত্তি স্থাপন ব্যতীত যেমন বাড়ি বানানোর অসম্ভব ঠিক বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া নিজেকে মুসলিম দাবি করাও অসম্ভব।

আকিদার পরিচয়:

শাব্দিক অর্থ : আক্বীদা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সম্পর্ক স্থাপন করা বা শক্তভাবে আকড়ে ধরা, অথবা কোন কিছুকে সাব্যস্ত করা বা শক্তিশালী হওয়া। অতএব মানুষ যার সাথে নিজের অন্তরের সুদৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন করে তাকেই আক্বীদা বলা যায়।

পারিভাষিক অর্থ: সাধারণভাবে সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অকাট্য কর্মধারাকে আক্বীদা বলা হয় যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির মনে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর ইসলামী আক্বীদা বলতে বুঝায়- আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই মহান প্রভুর প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত ও গুণবাচক নামসমূহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তাঁর ফেরেশতামন্ডলী, নবী-রাসূলগণ, তাঁদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ ও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কিত সংবাদসমূহ ইত্যাদি যে সব বিষয়াদির উপর সালাফে ছালেহীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন তার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর

নাযিলকৃত যাবতীয় আহকাম-নির্দেশনার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন এবং রাসূল (ছা:)-এর প্রচারিত শরী'আতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ নিশ্চিত করা

ইসলামী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। [ড. নাছের বিন আব্দুল করীম আল-আক্বল, মাবাহিসুন ফি আক্বীদায়ে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ: ৩]

আক্বীদা এবং শরী'আত দু'টি পৃথক বিষয়। কেননা শরী'আত হল দ্বীনের কর্মগত রূপ এবং আক্বীদা হলো দ্বীনের জ্ঞানগত রূপ যার প্রতি একজন মুসলমানের আন্তরিক বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও ভ্রষ্ট আক্বীদা:

বিশুদ্ধ আক্বীদা বলতে বুঝান হয় ইসলামী আক্বীদা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাকে যা আল্লাহ রাববুল আলামীন নির্দেশিত ও রাসূল (ছা:) কর্তৃক প্রচারিত অর্থাৎ যা পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সমর্থিত এবং সালাফে ছালেহীনের ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় আক্বীদা ও বিশ্বাস মিশ্রিত, কাল্পনিক, কুসংস্কারযুক্ত এবং মিথ্যার উপর ভিত্তিশীল। যা নিশ্চিতভাবে মানবজাতির গন্তব্যপথকে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।

আকিদার মৌলিক বিষয় সমূহ :

1. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা-

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি একমাত্র বিশ্বজগতের অধিপতি। তিনি একমাত্র স্রষ্টা। তার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তা রয়েছে সুন্দর নাম সমূহ অহংকার ও বড়ত্বের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। তিনি আসমান ও জমিনসমূহের একমাত্র মালিক। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের এর উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনতে হবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন -

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

(বাকারা ২: ২৫৫)

2.ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা:

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয়। ফেরেশতারা হলো আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ সৃষ্টি। ফেরেশতারা আল্লাহর বার্তাবাহক। তারা নিষ্পাপ ও পুত পবিত্র।

ফেরেশতারা নূরের তৈরি । তারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে । তাদের আহার ও নিদ্রার প্রয়োজন হয় না । তাদের সংখ্যা অগণিত ,আল্লাহ ছাড়া এদের সংখ্যা কেউ জানেন না । তারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত পালনে নিয়োজিত থাকেন। চারজন প্রধান ফেরেশতা রয়েছে জিব্রাইল(আ.), মিকাইল(আ.), ইসরাফিল (আ.), আজরাইল(আ.)। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(আল ইমরান ৩:১৮)

3.আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান :

নবী রাসুলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা আকিদার অন্যতম ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন বানী প্রচারের জন্য, এবং তাদের উপর আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। আসমানী কিতাব সমূহ অনেক তার মধ্যে চারটি প্রধান আসমানী কিতাব হল তাওরাত, যাবুর ,ইনজিল ,ও কুরআন । এই আসমানী কিতাব মানুষের হেদায়াত, কল্যাণ ও উভয় জগতের মুক্তির পথ দেখায়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য

(বাকারা ২:২)

َو آمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون

আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ।

(বাকারা ২:৪১)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواتَعْلَمُونَ

যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।

(বাকারা ২:১৫১)

4. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান:

আল্লাহর রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ফরজ। কেউ যদি তা অস্বীকার করে তাহলে সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না।রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হলো তাদের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাদের নবুওয়াতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা। আরো বিশ্বাস করা যে, নবী-রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা কিছু বলেছেন, তাতে তারা সত্যবাদী। তারা তাদের রিসালাতের দায়-দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য যা অজ্ঞ থাকা মোটেই উচিত নয়, তা তারা বর্ণনা করেছেন।

নবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক হওয়ার অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

‘‘তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করার মধ্যে কোনো ছাওয়াব নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে’’। (সূরা বাকারা: ১৭৭)

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা যেসব রসূলের নাম উল্লেখ করেছেন, নির্দিষ্টভাবে তাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। তাদের সংখ্যা মোট ২৫জন। তাদের মধ্য থেকে ১৮ জনের নাম একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

‘‘ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী। তারপর আমি ইবরাহীমকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকূবকে এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, ইতিপূর্বে নূহকেও আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। আর তারই বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে বদলা দিয়ে থাকি। তার সন্তানদের থেকে যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও সঠিক পথ দেখিয়েছি। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সৎকর্মশীল। ইসমাঈল, আল ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছি’’। (সূরা আন-আম: ৮৩-৮৬) বাকী সাতজনের কথা আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

5. আখিরাতের প্রতি ঈমান:

ঈমানের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে অন্যতম রুকন হলো আখিরাতে প্রতি ঈমান রাখা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুটি জীবন দিয়েছেন ইহকাল এবং পরকাল। অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন হল পরকাল বা আখিরাত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্যমতে মৃত্যু পরবর্তী পুরো জীবনটাই হলো পরকাল। পরকাল বলতে বারযাখী জীবন তথা কবরের ফিৎনা শান্তি বা শাস্তি, সিঙ্গার ফুৎকার, পুনরুত্থান, হাশর, শাফা‘আত, ক্বিয়ামত, বিচার-ফায়ছালা, মীযান বা দাঁড়িপাল্লা, হাউযে কাওছার, পুলছিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সমূহকে বুঝায়। আখেরাত সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন-

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।

(মুনতাহিনা ৬০:৩)

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

(বাকারা ২:৪)

6. তাকদিরের প্রতি ঈমান:

তাকদীর হল নির্ধারিত ভাগ্য। এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তার পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব কিছু নির্ধারণ করেছেন। এর প্রতি বিশ্বাসকে ইসলামে তাকদীর বলা হয়। ইসলামে তাকদীরের ওপর বিশ্বাস করা আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়াত বা প্রভুত্বের ওপর বিশ্বাস করার অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম একটি রুকন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন

আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে, আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মতো। ’

(সুরা : কামার, আয়াত : ৪৯-৫০)

আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ীই সব কিছু সংঘটিত হয়। আর আল্লাহ তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে (ভূগর্ভের অন্ধকার স্তরে) এমন কোনো শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই। ’ (সুরা : আনআম, আয়াত : ৫৯)

মুমিনের ভাগ্যে বিশ্বাস যেমন হবে : আবু আবদুল্লাহ ইবনে দায়লামি (রহ.) বলেন, আমি উবাই বিন কাব (রা.)-এর কাছে এসে তাকে বললাম, তাকদির সম্পর্কে আমার মনে একটা দ্বিধার উদ্রেক হয়েছে। তাই আপনি আমাকে এমন কিছু বলুন যাতে মহান আল্লাহ আমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করবেন।

তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর আসমান ও পৃথিবীবাসী সবাইকে শাস্তি দিতে পারেন। তার পরও তিনি তাদের প্রতি অন্যায়কারী হবেন না। পক্ষান্তরে তিনি যদি তাদের সবাইকে দয়া করেন তাহলে তাঁর এই দয়া তাদের জন্য তাদের নেক আমল হতে উত্তম হবে। সুতরাং যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে দান করো আর তাকদিরে বিশ্বাস না রাখো, তবে তা গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না তুমি পুনরায় তাকদিরে বিশ্বাস করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, যা তোমার ঘটেছে তা ভুলেও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আর যা এড়িয়ে গেছে তা কখনো ভুলেও তোমার বেলায় ঘটার ছিল না। আর এ বিশ্বাস ছাড়া তুমি মারা গেলে জাহান্নামে যাবে।
(সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৬৯৯)

এগুলোই হল ইসলামী আকিদার মূল ভিত্তি, যার কোন একটি বা আংশিক না থাকলে আকিদা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এগুলো ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক।

আখলাক

আখলাক কি :

আখলাক শব্দটি ‘খুলকুন’ শব্দের বহুবচন। আখলাক শব্দটি আরবী ‘খুল্ক’ শব্দ থেকে উৎসারিত। খুল্ক শব্দের অর্থ হ’ল মানুষের জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতি। এই শব্দটি জন্মগত স্বভাবের সমার্থবোধক। খাল্ক, খুল্ক ও খুলুক শব্দ মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে খাল্ক শব্দটি কখনও কখনও দৃশ্য বা আকৃতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে খুলুক শব্দটি মূলতঃ বোধ ও অনুভব সংশিস্নষ্ট কিছু বুঝাতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

আখলাক-এর মূল শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত খুলুক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়েছে। পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, খুলুক শব্দের অর্থ কখনও ‘স্বাভাবিক প্রবৃত্তি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনও কখনও একে ‘স্বভাব এবং প্রকৃতি’ এবং ‘পূর্ববর্তীদের স্বভাব’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত একজন তাফসীরকারক বলেন, ‘খুলুক হচ্ছে মানুষের মনের অন্তর্নিহিত এমন এক প্রবৃত্তি, যা তাকে তার উপযুক্ত ভাল-মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।’

আর হাসান শব্দের অর্থ হল সুন্দর,ভাল,উত্তম, কল্যাণকর ইত্যাদি।

মানবজীবনের উত্তম গুণাবলিকে প্রশংসনীয় চরিত্র বলে। যেমন- ধৈর্য, সততা, দেশপ্রেম ও সমাজসেবা ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে মানবজীবনের নিকৃষ্ট চরিত্রকে নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন- অহঙ্কার, ঘৃণা, মিথ্যাচার ও সুদ ইত্যাদি।

আপনাকে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাকের গুরুত্ব অনেক। প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ জাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন।

আর উন্নত চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহতায়ালা পাঠিয়েছেন।

ইসলাম মনে করে, আমলদার হওয়া একজন মুমিনের প্রশংসিত দিক।

সেই সঙ্গে চরিত্রবান হওয়াও একজন মুমিনের জন্যে আবশ্যকীয় দিক। কিন্তু আমলের তুলনায় চরিত্র মানুষের জন্য বেশি জরুরি।

উত্তম আখলাকে নিজেকে সজ্জিত করার প্রতিও উৎসাহ এসেছে ইসলামে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মানুষকে জান্নাতে অধিকহারে প্রবেশ করাবে কোন বিষয়' সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'আল্লাহভীতি ও উত্তম আখলাক। ' জিজ্ঞেস করা হলো-'জাহান্নামে অধিকহারে প্রবেশ করাবে কোন বিষয়' সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'মুখ ও লজ্জাস্থান। '

(–সুনানে তিরমিজি: ২০০৪)

আখলাক মূলত দুই প্রকার

1. আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র
2. আখলাকে সাইয়্যিআহ বা মন্দ চরিত্র

উত্তম চরিত্র

বিনয় ,উদারতা ,সত্যবাদিতা ,তাকওয়া ,আমানতদারিতা এগুলো উত্তম চরিত্রের উপাদান।

১.সত্যবাদিতা : আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) আমাদের যে সকল ইসলামী চরিত্রের নির্দেশ দিয়েছেন, তার অন্যতম হচ্ছে সত্যবাদিতার চরিত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও।" (সূরা আত-তাওবাহ :১১৯)

রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "তোমরা সততা অবলম্বন গ্রহণ কর, কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পূণ্য জান্নাতের পথ দেখায়, একজন লোক সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতি অনুরাগী হয়, ফলে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" (মুসলিম)

২. আমানতদারিতা : মুসলমানদের সে সব ইসলামী চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে আমানতসমূহ তার অধিকারীদের নিকট আদায় করে দেয়া। আল্লাহ তা`আলা বলেনঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট আদায় করে দিতে।”

(সূরা আন নিসা : ৫৮)

রাসূল (সাঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আল আমীন উপাধি লাভ করেছিলেন, তারা তাঁর নিকট তাদের সম্পদ আমানত রাখত। রাসূল (সাঃ) এবং তার অনুসারীদের মুশরিকরা কঠোর ভাবে নির্যাতন শুরু করার পর যখন আল্লাহ তাকে মক্কা হতে মদীনা হিজরত করার অনুমতি দিলেন তিনি আমানতের মালসমূহ তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা না করে হিজরত করেননি। অথচ যারা আমানত রেখেছিল তারা সকলেই ছিল কাফের। কিন্তু ইসলাম তো আমানত তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে যদিও তার অধিকারীরা কাফের হয়।

৩. অঙ্গীকার পূর্ণ করা : ইসলামী মহান চরিত্রের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

“আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।”

(সূরা ইসরা :৩৪)

আর রাসূল (সাঃ) প্রতিশ্র“তি ভঙ্গকরা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন।

৪. বিনয় : ইসলামী চরিত্রের আরেকটি হচ্ছে একজন মুসলমান তার অপর মুসলিম ভাইদের সাথে বিনয়ী আচরণ করবে। সে ধনী হোক বা গরীব। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তুমি তোমার পার্শ্বদেশ মুমিনদের জন্য অবনত করে দাও।”

(সূরা আল হিজর :৮৮)

“রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে”

[ফুরকানঃ ৬২]

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

“আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী করেছেন যে, ‘তোমরা বিনয়ী হও যাতে একজন অপরজনের উপর অহংকার না করে। একজন অপর জনের উপর সীমালংঘন না করে।” - মুসলিম।

অহংকার করা যাবে না।কারণ আল্লাহ বলেন,

“অহংকার কেবল আমার ভূষণ”

৫. মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার : মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার উত্তম চরিত্রের অন্যতম। আর এটা তাদের অধিকার মহান হওয়ার কারণে, যে অধিকার স্থান হল আল্লাহর হকের পরে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

‘আর আল্লাহ ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর।” ([সূরা আন-নিসা : ৩৫ আয়াত)

আল্লাহ তাআলা তাদের আনুগত্য, তাদের প্রতি দয়া ও বিনয় এবং তাদের জন্য দু’আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, ‘তোমার মা।’ অত:পর জিজ্ঞেস করল তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন, ‘তোমার মা।’ অতঃপর জিজ্ঞেস করল তার পর কে? তিনি উত্তর দিলেন, ‘তোমার মা।’ অতঃপর জিজ্ঞেস করল তার পর কে? উত্তর দিলেন, ‘তোমার পিতা।’ (বুখারী ও মুসলিম)

মাতা-পিতার প্রতি এ সদ্ব্যবহার ও দয়া অনুগ্রহ অতিরিক্ত বা পূর্ণতা দানকারী বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে সকল মানুষের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফরযে আইন।

৬.আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখা : আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামী চরিত্রের অন্যতম। আর তারা হচ্ছে নিকটাত্মীয়গণ যেমন, চাচা, মামা, ফুফা, খালা, ভাই, বোন প্রমূখ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব, আর তা ছিন্ন করা জান্নাত হতে বঞ্চিত ও অভিশাপের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“ যদি তোমরা ক্ষমতা পাও, তাহলে কি তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তারা তো ঐ সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। এতে তিনি তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন।” সূরা মুহাম্মাদ : ২২-২৩

রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না।” বুখারী ও মুসলিম

৭.ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা : ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা হচ্ছে ইসলামী চরিত্রের অন্যতম বিষয়। অনুরূপভাবে মানুষদের ক্ষমা করা, দুর্ব্যবহারকারীকে ছেড়ে দেয়া ওজর পেশকারীর ওজর গ্রহণ করা বা মেনে নেয়াও অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন : "আর যে ধৈর্য্য ধারণ করল এবং ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই এটা কাজের দৃঢ়তার অন্তর্ভূক্ত।" (সূরা আশ শুরা :৪৩)

রাসূল (সাঃ) বলেন,

'তারা যেন ক্ষমা করে দেয় এবং উদারতা দেখায়, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া কি তোমরা পছন্দ কর না?' রাসূল (সাঃ) বলেন, "দান খয়রাতে সম্পদ কমে যায় না। আল্লাহ পাক ক্ষমার দ্বারা বান্দার মার্যাদাই বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

"দয়া কর, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। ক্ষমা করে দাও তোমাদেরও ক্ষমা করে দেয়া হবে।" আহমাদ

৮. লজ্জা : ইসলামী চরিত্রের অন্যতম আরেকটি চরিত্র হচ্ছে লজ্জা। এটা এমন একটি চরিত্র যা পরিপূর্ণতা ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আহবান করে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা হতে বারণ করে। লজ্জা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। ফলে মুসলমান লজ্জা করে যে, আল্লাহ তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখবে। অনুরূপভাবে মানুষের থেকে এবং নিজের থেকেও সে লজ্জা করে। লজ্জা অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ বহন করে। নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

'লজ্জা ঈমানের বিশেষ অংশ।' (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সাঃ) আরও বলেন,

"লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

৯. ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা : ন্যায় পরায়ণতা ইসলামী চরিত্রের আরেকটি অংশ। এ চরিত্র আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টি করে। সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিভিনড়ব প্রকার অপরাধ বিমোচনের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ইহসান ও নিকটাত্মীয়দের দান করতে নির্দেশ দেন।" সূরা আল নাহাল : ৯০

আল্লাহ তাআলা বলেন : "ইনসাফ কর, এটা তাক্বওয়ার অতীব নিকটবর্তী।" সূরা আল মায়িদা : ৮

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “ন্যায়পরায় ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরের উপর বসবে। তারা হল সে সব লোক, যারা বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে এবং যে দায়িত্বই পেয়েছে তাতে ইনসাফ করে।”

১০.চারিত্রিক পবিত্রতা : ইসলামী চরিত্রের অন্যতম বিষয় হচ্ছে চারিত্রিক পবিত্রতা। এ চরিত্র মানুষের সম্মান সংরক্ষণ এবং বংশে সংমিশ্রন না হওয়ার দিকে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

“যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, তারা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা গ্রহণ করে। যতক্ষণ না আল্লাহ তার অনুগ্রহে তাকে সম্পদশালী করেন।” [সুরা আন নূর-৩৩]

রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,

“তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হও। তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। যখন তোমাদের কেউ কথা বলে সে যেন মিথ্যা না বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন যেন খেয়ানত না করে। যখন প্রতিশ্র“তি দেয় তা যেন ভঙ্গ না করে। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত কর। তোমাদের হস্তদ্বয় সংযত কর। তোমাদের লজ্জাস্থান হেজাফত কর।” [হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন]

১১. বিশ্বাস যোগ্যতাঃ বিশ্বাসযোগ্যতা আখলাকে হাসানার একটি অন্যতম প্রধান গুণ।এটি মানুষের ভিতর যত বেশী থাকবে মানুষ তাকে তত বেশী সম্মান করবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে।

১২. প্রজ্ঞাঃ প্রজ্ঞা মানুষের নৈতিক গুণাবলীর ভিতর একটি অন্যতম প্রধান গুণ যা না থাকলে মানুষ কখনও ভাল-মন্দ নিরুপুণ করতে পারে না।

১৩. ভদ্রতাঃ ভদ্রতা সচ্চরিত্রে অন্যতম একটি গুণ। এর মাধ্যমে সুন্দর অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।

১৪. উদারতাঃ উদারতা সচ্চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মধ্য থেকে সকল ধরনের সংকীর্ণতা দূর হবে।একবার মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি অমুক ব্যক্তির চেয়ে অধিক ধনী হয়ে গিয়েছি বলে সে আমাকে এড়িয়ে চলে আর আমার সাথে কথা বলে না।আমি কি তার সাথে একই

আচারণ প্রদর্শন করব। রাসূল(সাঃ) তাকে বললেন, "না তুমিও তার সাথে নমনীয় আচারণ করবে এবং মেহেমানদারী করবে।"

১৫. সততাঃ সততার মাধ্যমে একজন মানুষের ভিতর সৎ গুণাবলীর অভিব্যক্ত ঘটে। ইসলাম মানুষকে সততার সাথে জীবন অতিবাহিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছে।আল্লাহ বলেন,
"মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ।" [বনী-ইসরাইলঃ৩৫]

১৬.ক্ষমাঃ ক্ষমাশীলতা ইসলামের একটি অন্যতম মহৎগুণ যা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ(সাঃ) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছিল।ক্ষমাশীলয়ার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, "আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল" [আরাফঃ১৯৯]

বস্তুত একমাত্র আখলাকে হাসানার মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা পায়।

মন্দ চরিত্র:
মানুষের চরিত্রের খারাপ ও বর্জনীয় দিকগুলোই হলো আখলাকে সাইয়্যিআহ।,মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ধোঁকা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, গিবত, গালি ও মন্দ কথা, অশ্লীলতা, অপচয়, অহংকার, ক্ষতিকর আসক্তি ইত্যাদিকে বোঝায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "দুষ্ট ও কঠোর স্বভাবের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (আবু দাউদ)

১. মিথ্যা কথা: মিথ্যাচার একটি নিন্দনীয় আচরণ। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না এবং ভালোবাসে না। বিপদের সময় তাকে কেউ সাহায্য করতে আসে না। তার কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। মহান আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। মহান আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা দূরে থাক মিথ্যা কখন থেকে।' (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩০)

পবিত্র কোরআনে বহু আয়াতে নানাবিধ মন্দ কাজ নিষেধ করা হয়েছে।

মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, মিথ্যা পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের নিদর্শনও বটে। হাদিসে বলা হয়েছে,

أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أَوْ تُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

অর্থ: মুনাফিকের আলামত তিনটি- যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, আমানতের খেয়ানত করে এবং ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

২. প্রতারণা:প্রতারণা হচ্ছে অসদুপায় অবলম্বন করে কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা। প্রচলিত আইন বা নিয়ম-কানুনকে উপেক্ষা করে কিংবা ফাঁকি দিয়ে অসৎ উপায়ে কোনো কিছু অর্জন করাকে প্রতারণা বলে। আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকমের প্রতারণামূলক কাজ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- বিশ্বাস ভঙ্গ করা, মিথ্যা শপথ করা, ওজনে কম দেওয়া, পণ্য বিক্রিতে দোষ গোপন করা, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, দেশে-বিদেশে চাকরি দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, অফিস-আদালত ও লেনদেনে দুর্নীতি করা এবং পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা ইত্যাদি।

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

অর্থ: 'দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে কিন্তু অন্যকে মেপে ও ওজন করে দেওয়ার সময় কম দেয়।' (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ১-৩)

৩. গীবত:গিবত একটি সামাজিক অনাচার। কারও অগোচরে তার দোষ-ত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করাকে গিবত বলে। একে পরনিন্দাও বলা হয়। গিবত একটি ঘৃর্ণিত ও জঘন্য কাজ। এটি কবিরা গুনাহ। এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'গিবত কী তা কি তোমরা জানো?" লোকেরা উত্তরে বলল,

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো। জানেন। রাসুলুল্লাহ (সা.] বললেন, 'গিবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তার অগোচরে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ

অর্থ: 'তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে, নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে।' (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১২)

গিবত করার মতো গিবত শোনাও পাপের কাজ। কেউ গিবত করলে তাকে গিবত থেকে বিরত রাখা কর্তব্য। তাহলে গিবতচর্চা সমাজ থেকে দূরীভূত হবে।

৪. গালি ও মন্দ কথা:

কাউকে মন্দ নামে ডাকা, মন্দ কথা বলা, তিরস্কার করা, অশালীন বা অভীল কথা বলা হলো গালি দেওয়া। এটি একটি নিন্দনীয় কাজ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ

অর্থ: ইমান আনয়নের পর মন্দ নামে ডাকা অতিশয় গর্হিত কাজ।' (সুরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১১)

৫. হিংসা ও লোভ: মানুষের অন্যতম একটি খারাপ গুণ হল হিংসা। ইসলামে হিংসা বা বিদ্বেষ পোষনকারীকে খুবই নিকৃষ্ট চোখে দেখা হয়েছে। হিংসা মানুষকে শুধুমাত্র প্রতিপন্নই করে না বরং হিংসুকের জীবন কখনই সুখের হয় না। কেননা সে সবসময় সকল জিনিসের অধিকারী হতে চায়। তার সর্বদা এই চেষ্টাই থাকে যে, অন্যের কাছে যা আছে তারচে তার জিনিসটা ভাল হওয়া চাই। আর এই হিংসুক ব্যক্তিই সমাজের অন্যান্য সন্মানিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বকে হেয় করার চেষ্টা করে।

ইমাম বাকির (আঃ) বলেছেন : 'নিশ্চয়ই যেভাবে আগুন কাঠকে ভক্ষণ করে [জ্বালিয়ে নিঃশ্বেষ করে], হিংসাও ঈমানকে ভক্ষণ করে'।

(আল কাফী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০৬, হাদীস নং ১)

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বললেন : 'হিংসুকের তিনটি চিহ্ন রয়েছে : পিঠ-পিছনে গীবতকরে, সামনা সামনি তোষামোদ করে এবং অন্যের বিপদে আনন্দিত হয়।' (আল খেসাল, পৃষ্ঠা ১২১, হাদীস নং ১১৩)

লোভ মানুষের অধপতনের অন্যতম কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। যেহেতু লোভ একটি নৈতিক ত্রুটি, তাই বর্তমানে এই বিষয়টি উপর আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন, আর তাই এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। লোভ মানুষের জীবন থেকে সুখ কেড়ে নেয়। আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত তাকে দান করেছেন তার শুকরিয়া কখনই সে আদায় তো করেই না, বরং আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তার চেয়ে সে বেশী চায় এবং যদি সেটা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে সে আবার নতুন করে আর একটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যক্তি একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে, যদি সে লোভী হয় এবং আল্লাহর শুকুর গোযার না হয় সবসময় তার এই চিন্তা থাকে যে, আরো উন্নত একটি বাড়ি ভাড়া নিতে হবে। যখন পূর্বের চেয়ে আরো উন্নত বাড়ি সে ভাড়া নিতে সক্ষম হয়, তখন সে আবার নতুন করে অন্যের সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি দেয় যে, এবার যদি অমুকের মত একটি সুন্দর বাড়ি বানাতে পারতাম। এভাবেই চলতে থাকে তার লোভের চক্র। আর কখনই সে এ সমস্ত নেয়ামত যা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছে তার শুকুর আদায় করে না।

কিন্তু আল্লাহ্র মু'মিন বান্দারা যে সকল নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ও তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আর যদি পরবর্তীতে কিছু তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় তবে তার জন্য সে আল্লাহর দরবারে পূর্বাপেক্ষা অধিক শুকরিয়া আদায় করে। আর ভুলেও সে অন্যের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। মু'মিনদের এ দলটি সর্বদাই সুখে ও শান্তিতে বসবাস করন।

আমরা সকলে মন্দ চরিত্র থেকে নিজেকে হেফাজত করার চেষ্টা করব। সমস্ত মন্দ কাজের প্রভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করব । উত্তম চরিত্র যেমন আশেপাশের

মানুষের উপর ও প্রভাব পড়ে ঠিক তেমনি মন্দ চরিত্রেও আমাদের আশেপাশের মানুষের উপর প্রভাব পড়ে। মন্দ চরিত্র আল্লাহর এবাদত থেকে আমাদের গাফেল করে রাখে।

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ রাববুল আলামীন প্রথমে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর পাজর থেকে জুড়ি হিসেবে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেন। তাঁদের উভয়ের দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পৃথিবীতে পরিবারের সূচনা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَّنِسَاءً "

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

(সূরা আন নিসা ৪:১)

মানুষ সকল যুগ ও কালে কোন না কোনভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীন কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর আদি সংস্থা।

মানব জীবনের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। ব্যক্তি পরিবারের একটা অংশ। আর পরিবার সমাজের অংশ ও ভিত্তিপ্রস্তর। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না, তেমনি পরিবার ছাড়া সমাজও অকল্পনীয়। পরিবার ঠিক হলে ব্যক্তি ঠিক হয়ে যায়। আর ব্যক্তি ঠিক হয়ে গেলে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। সুখে-সমৃদ্ধিতে গড়ে ওঠে সর্বাঙ্গীন সুন্দর এক সমাজ কাঠামো। এজন্য ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে এবং কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবার।

পরিবার গঠনে ইসলামের গুরুত্ব :

পরিবার হলো ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের প্রথম বীজ। একটি মানব শিশু তার মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। কারণ একটি মানব শিশু সব রকমের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে থাকে। তখন একমাত্র পরিবারই তার সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করে থাকে। এজন্যই পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্ক হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র । আর একটি পরিবারের সুসম্পর্ক তখনই হয় যখন সেই পরিবারে সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণ নীতি পালন করে। ইসলামী শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সত্যবাদী মুমিন রক্ষণশীল প্রতিনিধি ও দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষ তৈরি করা। আল্লাহর পরিচয় জানা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করা। সকল প্রয়োজনে কেবল তারই দারস্ত হওয়া। অতি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল চাওয়া পাওয়া কেবল সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার দ্বারস্থ হওয়া। প্রতিনিধিত্ব দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। এছাড়াও সঠিক অনুভূতি, বাস্তবধর্মী কর্মপদ্ধতি, হৃদয়ের সাহস, আমানত আবশ্যিক উপকরণ। কাজের দক্ষতা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ছাড়া এ লক্ষ্যে পৌঁছানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

আর সম্ভাবনাময় একজন মানুষ গঠন করতে হলে এ সকল উন্নত গুণাবলীর বীজ মানব শিশুর মূল উৎস শিশু বয়সেই স্থাপন করতে হবে। এজন্যই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্কই হচ্ছে শিশুদের ইসলামিক শিক্ষা তথা নববী শিক্ষার কারিকুলামের মূল ভিত্তি। তাই আমাদের পরিবার ও পারিবারিক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে আমরা আমাদের শিশুদের যথাযথ তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে সঠিকভাবে লালন পালন করতে পারি।বিশেষ করে বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম জাতিকে যেন হিফাযত করা যায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ٢١]

“আর তাঁর নিদর্শনা-বলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে”।

[সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: ٧٤]

“যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর”।

[সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন:

“চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে, (২) বংশ মর্যাদার কারণে, (৩) শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দীনদারীর কারণে। অতএব, তুমি ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। তোমার দু’হাত ধূলি ধূসরিত (তথা উত্তম) হোক।

ইমাম তিরমিযী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যখন তোমাদের নিকট এমন কোনোও দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে”।

[তিরমিজি হাদিস নং : ১০৮৪]

ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম রহ. সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"তোমরা স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর, যাতে আমি কিয়ামতের দিন অধিক উম্মতের মাধ্যমে গর্ব করতে পারি।

[আহমদ হাদিস নং :১২৬১৩]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

"তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, নেতাও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষও তার পরিবারের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীও তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

[তিরমিজি হাদিস নং : ১৭০৫]

এ হচ্ছে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব, একমাত্র পরিবারই হচ্ছে সঠিকভাবে মানব তৈরির কারখানা এবং মানব শিশুর সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। আর ইসলাম পরিবারকে এ ধরনের গুরুত্ব প্রদান- এটা আশ্চর্যের কোনোও বিষয় নয়। কারণ, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। অপরদিকে এ সৃষ্টি জগতের প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানব সন্তানের শিশুকাল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়। এমনকি এক দশকের চেয়েও বেশি সময় অতিক্রম করতে হয় শিশুকাল/বাল্যকাল পাড়ি দিতে। এ জন্যই শিশুকে তার বাল্যজীবনে মানসিক, শারীরিক আত্মিক তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। খলিফা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ও প্রস্তুত করার জন্য। আর এ সকল প্রয়োজন একমাত্র পরিবারই দিয়ে থাকে। সুতরাং মানব শিশুর আত্মিক, শারীরিক, বৈষয়িক বিকাশ এবং সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি-অবনতি, ইতিবাচক

হোক আর নেতিবাচক হোক সকল ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।এ সকল কারণে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, কেন ইসলাম পরিবার ও পরিবার গঠন এত বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে এবং পরিবার গঠনকে পৈত্রিক ও মাতৃক সুসম্পর্ক এবং মানুষের ফিৎরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পরিবারের ভীত মজবুত করা এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আর এ জন্যই ইসলাম পরিবার গঠন, মানুষের ফিৎরাত, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অধিকার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

[ফুটনোট- সোর্স :www.hadithbd.com]

বিয়ের হুকুম ও বিধান:

বিয়ে করা নবী-রাসূলগণের সুন্নাত। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ বিয়ে করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَّذُرِّيَّةً "তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।" (সূরা আর রা'দ, আয়াত ৩৮)। সাহাবীগণ ও বরেণ্য ইমামগণও বিয়ে করেছেন। সাধারণভাবে বিয়ে করা সুন্নাত। তবে বিয়ের হুকুম সকলের ক্ষেত্রে একই রকম নয়। ব্যক্তি ভেদে তা ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মাকরূহ প্রভৃতি হয়ে থাকে।

1.ওয়াজিব : যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, বিয়ে না করলে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার নিশ্চিত আশংকায় নিপতিত হয় এবং মোহর ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা রাখে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য।

2.মুস্তাহাব : যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, কিন্তু ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার ভয় করে না তার জন্য বিয়ে করা মুস্তাহাব। এমতাবস্থায় নির্জনে ইবাদত করার চেয়ে বিয়ে করা উত্তম। কারণ ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. "তোমরা বিয়ে কর। কারণ আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য

উম্মতের সামনে গর্ব করব। আর তোমরা খ্রিস্টানদের বৈরাগ্যবাদের অনুসারী হয়ো না।”

3.মাকরূহ : স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম হওয়া, খারাপ ব্যবহার করা বা স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে আগ্রহ না থাকার কারণে বিয়ে করলে অন্যের প্রতি যুল্ম-অত্যাচার করা হবে বলে যদি ভয় হয় (দৃঢ় বা নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে না হয়) তাহলে বিয়ে করা মাকরূহ।

বিবাহের উপকারিতা :

১- পারিবারিক সম্পর্ক বজায়, পরস্পর ভালোবাসা বিনিময়, আত্মসংযম ও হারাম কাজ থেকে নিজেকে হিফাযত করতে বিবাহ একটি উত্তম মাধ্যম ও উপায়।

২- (হালালভাবে) বংশ পরিক্রমা ঠিক রেখে সন্তান জন্ম দেওয়া ও বংশ বিস্তারে বিবাহ একটি উত্তম পদ্ধতি।

৩- নানা রোগ-ব্যাধিমুক্ত ও নিরাপদে মানুষের যৌন চাহিদা মিটাতে ও মনোবাসনা পূরণ করতে বিবাহ একটি সুন্দরতম পদ্ধতি।

৪- বিবাহের মাধ্যমে সন্তান লাভের দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্বাদ ভোগ করা যায়।

৫- বিবাহে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য শান্তির আবাস, প্রশান্তি, শালীনতা ও সচ্চরিত্র।

বিবাহের শাব্দিক সংজ্ঞা:

নিকাহ তথা বিবাহের শাব্দিক অর্থ যৌন সঙ্গম, দু’টি জিনিস একত্রিত করা। কখনও কখনও নিকাহ বন্ধন বা চুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়,যখন কেউ বিয়ে করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার বলা হয়, সে তার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করল।

শরী'আতের পরিভাষায় বিবাহ:

"নিকাহ হলো এমন একটি চুক্তি যাতে 'বিবাহ দেওয়া বা বিবাহ করা' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে উপভোগ বা একত্রে থাকা বা পরস্পর অংশীদার হওয়া বুঝায়"।

বিবাহ সংঘটিত হওয়ার শব্দাবলী:

যে কোনো ভাষায় বিবাহ করা বা দেওয়া বুঝায় এমন সব শব্দে বিবাহ সংঘটিত হবে। যেমন বলা, আমি বিবাহ করলাম বা বিয়ে দিলাম। অথবা বলা, আমি এ বিয়ে কবুল করলাম। অথবা আমি তাকে বিয়ে করলাম, বা আমি বিয়ে করলাম, অথবা এ বিয়ে আমি রাজি আছি।

আরবী ভাষার শব্দ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তবে যারা আরবী ভাষা জানেন না তারা তাদের ভাষায় প্রস্তাবনা ও কবুল করলেই বিয়ে সংঘটিত হবে।

বিবাহের রুকনসমূহ:

বিয়ের রুকন দু'টি। তা হলো:

১- প্রস্তাব : অলী তথা অভিভাবক অথবা যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তার পক্ষ থেকে বিয়ে করার বা বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া। যিনি আরবী ভালো পারেন তার শব্দ দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া উত্তম। কেননা এ শব্দদ্বয় কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾

"তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে।"
[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩]

২- কবুল : স্বামী বা তার স্থলাভিষিক্ত থেকে বিয়ে কবুল করার শব্দ। যেমন বলা, (قبلت) আমি বিয়ে কবুল করলাম বা এ বিয়ে আমি রাজি আছি বা শুধু কবুল করেছি বলা। ইজাব তথা প্রস্তাব কবুলের আগে হতে হবে, তবে কোনো আলামত থাকলে আগে কবুল বললেও হবে।

বিবাহের শর্তাবলী:

বিয়ের শর্ত চারটি। তা হচ্ছে:

১- স্বামী-স্ত্রী নির্ধারিত হওয়া।

২- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকা। অতএব, স্বামী-স্ত্রী কাউকে জোর করে বিয়ে দেওয়া জায়েয নেই। কুমারী ও অকুমারী উভয়ের অনুমতি নিবে। কুমারীর চুপ থাকা তার অনুমতি দেওয়া আর অকুমারীর মৌখিক সম্মতি নিতে হবে। পাগল ও নির্বোধের ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়।

৩- অভিভাবক: অভিভাবক পুরুষ, স্বাধীন, বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক), আকেল (জ্ঞানবান), বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। এছাড়া একই দীনের অনুসারী হওয়াও শর্ত। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা তার অভিভাবক হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য, অতঃপর বাবার অসিয়তকৃত ব্যক্তি, অতঃপর তার দাদা, এভাবে উর্ধতন দাদারা, অতঃপর তার ছেলে ও নিম্নতম ছেলেরা, তার সহোদর ভাই, অতঃপর তার বৈমাত্রেয় ভাই, অতঃপর এসব ভাইয়ের ছেলেরা, অতঃপর, আপন চাচা, অতঃপর বৈমাত্রেয় চাচা, অতঃপর তাদের সন্তানেরা, অতঃপর বংশীয় নিকটাত্মীয়রা, অতঃপর দেশের বাদশাহ অভিভাবক হবেন।

৪- সাক্ষ্য: ন্যায়পরায়ণ, পুরুষ ও শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য (প্রাপ্তবয়স্ক) এমন দুজন সাক্ষ্যের সাক্ষী ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

৫- স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিবাহ বন্ধনে শরী'আতের নিষেধাজ্ঞামুক্ত থাকা (অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া)।

বিবাহে যেসব কাজ সুন্নাত ও যেসব কাজ হারাম:

যে ব্যক্তি দীনদারিতা, ভিনদেশীয়তা, কুমারী, সন্তান ও সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা বজায় রাখতে পারবে না তার জন্য একটি বিয়ে করা সুন্নাত।

বিয়ের খিতবা তথা প্রস্তাব দেওয়া কন্যাকে সতর ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালোভাবে দেখা মুস্তাহাব, যাতে তাকে বিয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলে, তবে নির্জনে দেখতে পারবে না। এমনিভাবে কনেও হবু বরকে ভালোভাবে দেখা মুস্তাহাব।

বিয়ের প্রস্তাবকারী বরের পক্ষে মেয়েকে দেখা সম্ভব না হলে সে একজন বিশ্বস্ত নারী পাঠাবে, তিনি ভালোভাবে দেখে তাকে মেয়ের গুণাবলী বর্ণনা করবে।

কেউ কোনো মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলে উক্ত প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া বা তাকে দেখার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ উক্ত মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হারাম।

যেসব নারী তিন ত্বালাক ব্যতীত বায়েন ত্বালাকের ইদ্দত পালনরত তাদেরকে স্পষ্ট বা ইশারায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ।

তবে রাজ‘ঈ তালাকের ইদ্দত পালনকারী নারীকে স্পষ্ট বা ইশারায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হারাম।

জুম‘আর দিন (শুক্রবার) বিকেলে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত। কেননা আসরের সালাতের পরের সময় দো‘আ কবুল হয় এবং সম্ভব হলে মসজিদে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত।

[সোর্স:www.hadithbd.com]

পাত্রী নির্বাচন :

পাত্রী বা স্ত্রী নির্বাচন হচ্ছে পরিবার গঠনের দ্বিতীয় স্তর। বলা হয়, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। সেজন্য স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। কারণ স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর জন্য প্রশান্তির উৎস, জীবনসঙ্গিনী, বাড়ির গিন্নী, সন্তানদের মা ও পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সন্তানেরা তার কাছ থেকেই সৎ গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হয়, তার কোলেই পরম স্নেহের আবেশে বেড়ে ওঠে এবং তার আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয় সন্তানদের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

"তোমাদের প্রত্যেকের শুক্রকারী অন্তর ও যিক্রকারী জিহ্বা হওয়া উচিৎ। আর এমন মুমিন স্ত্রী গ্রহণ করা উচিৎ; যে তার আখেরাতের কাজে সহায়তা করবে।"[2]

সুতরাং এমন পাত্রী পছন্দ করা উচিৎ, যে হবে পুণ্যময়ী, সুশীলা, সচ্চরিত্রা, দ্বীনদার, পর্দানশীন; যাকে দেখলে মন খুশীতে ভরে ওঠে, যাকে আদেশ করলে সত্বর পালন করে, স্বামী বাইরে গেলে নিজের দেহ, সৌন্দর্য ও ইজ্জতের এবং স্বামীর ধন-সম্পদের যথার্থ রক্ষণা-বেক্ষণা করে।[3]

মহান আল্লাহ বলেন,

"সুতরাং সাধবী নারী তো তারা, যারা (তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে ও লোক চক্ষুর অন্তরালে) অনুগতা এবং নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাযতে (তওফীকে) তারা তা হিফাযত করে।"[4]

এরপর দেখা উচিৎ, ভাবী-সঙ্গিনীর পরিবেশ। শান্ত প্রকৃতির মেজাজ, মানসিক সুস্থতা ইত্যাদি; যাতে সংসার হয় প্রশান্তিময়। জবালাময়তা থেকে দূর হয় বাক্যালাপ, লেন-দেন ও সকল ব্যবহার।

বিবাহের একটি মহান উদ্দেশ্য হল সন্তান গ্রহণ । এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্ত্রী নির্বাচন বাঞ্ছনীয়।

প্রিয় নবী সাঃ বলেন
"অধিক প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী রমণী বিবাহ কর। কারণ, আমি তোমাদেরকে নিয়ে কিয়ামতে অন্যান্য উম্মতের সামনে (সংখ্যাধিক্যের ফলে) গর্ব করব।"[5]

অতঃপর সাথীর রূপ-সৌন্দর্য তো মানুষের প্রকৃতিগত বাঞ্ছিত বাসনা। যেহেতু স্ত্রী সুন্দরী হলে মনের প্রশান্তি ও আনন্দ অধিক হয়। অন্যান্য রমণীর প্রতি কখনই মন ছুটে না। পরন্তু "আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[6]

পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনের দ্বীনদারিতার গুরুত্ব:

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন কত কঠিন বিষয়; এক দিক মেলে তো আরেক দিক মেলে না। তাই এক্ষেত্রে হাদীসের শিক্ষা হল-যখন কোনো পাত্র বা পাত্রীর মাঝে দ্বীনদারী ও উত্তম আখলাক পেয়ে যাও তো বুঝে নাও এখানে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এমনকি যদি অন্যান্য বিষয় অতটা পছন্দ নাও হয়। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ.

তোমাদের নিকট যদি এমন কারো প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেল। অন্যথায় জগতে ফিতনা ও বিশৃংখলা হবে।

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন-

يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرّاتٍ.

ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তার মধ্যে অন্য কোনো ত্রুটি থাকে? জবাবে আল্লাহর রাসূল তিন বার বললেন-

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ.

তোমাদের নিকট যদি এমন কারো প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেল। -

(জামে তিরমিযী, হাদীস ১০৮৫; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ১৩৪৮১)

বিবাহ মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। স্বাভাবিক জীবনের অনিবার্য একটি প্রয়োজন। একজন মানুষ যখন শিশু হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয় তখনই তার মাঝে খাবারের চাহিদা থাকে; বরং মাতৃগর্ভে প্রাণ সঞ্চারের পর থেকেই তার মাঝে খাবারের চাহিদা সৃষ্টি হয়। এ সময় তার মাঝে মানবজীবনের অন্য অনেক সাধারণ চাহিদা থাকে না।

সে ভূমিষ্ঠ হয়ে ধীরে ধীরে যখন বড় হতে থাকে তখন পর্যায়ক্রমে তার অনেক প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। যখন সে আরো বড় হয়, পরিণত বয়সে উপনীত হয় তখন তার বিবাহের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিভেদে মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন থাকতে পারে, তবে কিছু প্রয়োজন এমন রয়েছে, যা প্রায় প্রতিটি মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। বিবাহ তারই একটি।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং একে মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু সমগ্র জগৎ আল্লাহরই সৃষ্টি, জগতের নিয়ম-নীতি তিনিই তৈরি করেছেন, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি তাঁরই সৃষ্টি, তাই প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে এমন উপাদান তিনি দান করেছেন, যার মাধ্যমে জগৎটা সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে। এ ব্যবস্থা তাঁরই দেয়া। তাঁরই হিকমত।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে এটি একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীণীকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, সেইসব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। -সূরা রূম (৩০) : ২১

অন্যত্র আরো ইরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই তাঁর স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পারে। -সূরা আরাফ (৭) : ১৮৯

একসময় মানুষ ছিল না। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করতে চাইলেন। উদ্দেশ্য, তারা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর হেদায়েত মত চলবে। আল্লাহ কীভাবে মানুষ সৃষ্টি করলেন? একসাথে? না, বরং প্রথমে একজন, অতপর তার থেকে তার স্ত্রী, অতপর তাদের থেকে সকল মানুষকে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیْرًا وَّ نِسَآءً.

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তারই থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। -সূরা নিসা (৪) : ১

মানুষের মাঝে বিবাহরীতি আল্লাহই দান করেছেন। আর আল্লাহপ্রদত্ত এ বিবাহরীতিতে শুধু জাগতিক দিকটিই মুখ্য নয়; বরং তাতে দ¦ীনী বা ধর্মীয় দিকটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসলাম এ বিধানের হাকীকত ও উদ্দেশ্য এবং এর নীতিমালাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তাদের মূল লক্ষ্য আখেরাতের জীবন। দুনিয়ায় সুশৃঙ্খল জীবনের সাথে সাথে আখেরাতে কীভাবে তারা সফল হবে, সেজন্য তিনি তাদের দিয়েছেন বিস্তারিত পথনির্দেশ। তাই সব কাজে আখেরাতকে স্মরণ রাখা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সুতরাং নিছক জাগতিক বিষয়গুলোও সে এমনভাবে সম্পাদন করবে, যা দ্বারা সে আখেরাতে সফল হবে। এটাই শরীয়তে কাম্য এবং বিবেকের দাবি।

বিবাহের প্রসঙ্গটিও এমন। বিবাহকে শরীয়ত নিতান্তই জাগতিক বিষয় বিবেচনা করে না; বরং সেটাকে স্বামী-স্ত্রী এবং তৎপরবর্তী সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আখেরাতের সফলতার মাধ্যমও বিবেচনা করে।

দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী, দ্বীনদার পরিবার

একটি দ্বীনদার পরিবার, দ্বীনদার সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হল, দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রী। এজন্য বিবাহের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার আগে এ বিষয়টি লক্ষ রাখতে বলেছেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَنْكِحُوا الصّالِحِينَ وَالصّالِحَاتِ، فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ.

নারীদেরকে সালেহ (দ্বীনদার-নেককার) পুরুষের নিকট বিবাহ দাও, আর পুরুষদেরকে সালেহা (দ্বীনদার-নেককার) নারীর সাথে বিবাহ দাও; ফলশ্রুতিতে তাদের যে সন্তান হবে তারা হবে উত্তম (নেককার)। -সুনানে দারিমী, হাদীস ২২২৭

এজন্য শরীয়ত বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারীর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে ইসতেখারা

যে কোনো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এলে শরীয়ত প্রথমে ইসতেখারা করতে বলে। বিবাহও জীবনের একটি গুরুত¦পূর্ণ বিষয়, ফলে এক্ষেত্রেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতেখারা করতে বলেছেন। প্রিয় সাহাবী আবু আইয়ূব আনসারী রা.-কে তার বিবাহের বিষয়ে কীভাবে ইসতেখারা করবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- প্রথমে তোমার প্রস্তাব গোপন রাখো, অতপর উত্তমরূপে অযু কর এবং যে কয় রাকাত সম্ভব নামায পড়, অতপর আল্লাহর প্রশংসা করে বল-

اللّهُمّ إِنّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلّامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِيَ فُلَانَةَ - وَتُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا - خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي ذَلِكَ.

হে আল্লাহ! আপনি সক্ষম আমি অক্ষম। আপনি জানেন আমি জানি না। আপনি গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক অবগত; আপনি যদি অমুককে (পাত্রীর নাম নিবে) আমার

দ্বীন-দুনিয়া এবং আখেরাতের ক্ষেত্রে কল্যাণকর মনে করেন তাহলে তাকে আমার জন্য সহজ করে দিন। আর যদি তার থেকে অন্য কেউ আমার দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হয় তাহলে আমার জন্য তাই ফয়সালা করুন। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০৪০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৫৯৬

এ বর্ণনায় দুআটি এ ভাষায়ই এসেছে। তবে প্রসিদ্ধ হল-

اللّٰهُمّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...

যা সহীহ বুখারীসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে।

সামান্য ভাবলেই বুঝা যায় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বীনদারী ও আখেরাতের কল্যাণকে কী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য সহায়ক ও মঙ্গলজনক হলে আল্লাহ তুমি সহজ কর, অন্যথায় নয়। অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য সহায়ক ও মঙ্গলজনক হলে অগ্রসর হওয়া, অন্যথায় নয়। খুবই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নীতি ও নির্দেশনা।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে দ্বীনদারী ও উত্তম আখলাকের গুরুত্ব

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন কত কঠিন বিষয়; এক দিক মেলে তো আরেক দিক মেলে না। তাই এক্ষেত্রে হাদীসের শিক্ষা হল-যখন কোনো পাত্র বা পাত্রীর মাঝে দ্বীনদারী ও উত্তম আখলাক পেয়ে যাও তো বুঝে নাও এখানে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এমনকি যদি অন্যান্য বিষয় অতটা পছন্দ নাও হয়। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ.

তোমাদের নিকট যদি এমন কারো প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেল। অন্যথায় জগতে ফিতনা ও বিশৃংখলা হবে।

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন-

يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرّاتٍ.

ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তার মধ্যে অন্য কোনো ত্রুটি থাকে? জবাবে আল্লাহর রাসূল তিন বার বললেন-

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ.

তোমাদের নিকট যদি এমন কারো প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেল। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১০৮৫; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ১৩৪৮১

প্রাধান্য দাও দ্বীনদারীকে-

বিবাহের ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়কে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে। সৌন্দর্য! তা তো দুই দিনের। সম্পদ! তা তো যখন-তখন হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন- তুমি দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দাও । তিনি বলেছেন-

নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি জিনিস দেখে। তার সম্পদ দেখে, বংশমর্যাদা দেখে। রূপ দেখে এবং দ্বীনদারী দেখে। (হে মুমিন!) তুমি দ্বীনদার নারী বিবাহ করে ধন্য হয়ে যাও। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৬৬

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

নারীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে তার অর্থ সম্পদের জন্য, রূপের জন্য, তার দ্বীনের জন্য। তুমি দ্বীনদার-চরিত্রবান নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০৩৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১৭৬৫

পৃথিবীতে মানুষ যত নিআমত লাভ করে, এর মধ্যে নেককার স্ত্রী অন্যতম প্রধান নিআমত। স্ত্রী নেককার ও আখলাকওয়ালা হলে পরিবারে জান্নাতী আবেশ বিরাজ করে। অন্যথায় শান্তির পরিবারই হয়ে যায় সাক্ষাৎ জাহান্নাম। তাই তো নেককার স্ত্রীকে হাদীস শরীফে মহা নিআমত ও সৌভাগ্যের বিষয় বলা হয়েছে। আর বদকার স্ত্রীকে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، مِن سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السّوءُ .

আদম সন্তানের সৌভাগ্যের বিষয় তিনটি। তেমনি দুর্ভাগ্যের বিষয়ও তিনটি। প্রথম তিনটি হল, সালিহা (দ্বীনদার-নেককার) স্ত্রী, ভালো বাসস্থান, ভালো সওয়ারী। দ্বিতীয় তিনটি হল, খারাপ স্ত্রী, খারাপ বাসস্থান ও খারাপ সওয়ারী।

(-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪৪)

[নোট মাসিক আল কাউসার]

মোহরানা:

মোহরানা বা দেনমোহর বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ হক বা অধিকার। ইসলামে মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। একটি সম্পূর্ণ মহারানা হালাল হিসেবে গ্রহণ করবেন স্ত্রীকে মোহরানা দেওয়া ওয়াজিব এর পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: النحلة মানে মোহরানা।

ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারগণের বক্তব্যের মর্মার্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: "পুরুষের উপর স্ত্রীকে মোহরানা দেওয়া অপরিহার্য ওয়াজিব এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে হবে"।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে এবং তাদের কাউকে (মোহরানাস্বরূপ) বিপুল সম্পদ দিয়ে থাকলে তা থেকে কিছুই নেবে না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে আর স্পষ্ট পাপ করে তা (ফেরত) নিতে চাচ্ছ? তোমরা তা কিভাবে (ফেরত) নিতে পার, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়েছ (সহবাস করেছ) আর তারাও তোমাদের কাছ থেকে শক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।"

[সূরা নিসা ৪: ২০-২১]

ইসলামে মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহরানা হালাল হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিছু কিছু দেশে যে কথা ছড়িয়ে আছে যে, স্ত্রীর কোন মোহরানা প্রাপ্য নেই ইসলামের বিধান এর বিপরীত। স্ত্রীকে মোহরানা দেয়া ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে। যেমন:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে/ফরয জেনে/ নারীদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান কর।"[সূরা নিসা, আয়াত: ৪]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: النحلة মানে মোহরানা।

ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারগণের বক্তব্যের মর্মার্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: "পুরুষের উপর স্ত্রীকে মোহরানা দেওয়া অপরিহার্য ওয়াজিব এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে হবে"।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে এবং তাদের কাউকে (মোহরানাস্বরূপ) বিপুল সম্পদ দিয়ে থাকলে তা থেকে কিছুই নেবে না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে আর স্পষ্ট পাপ করে তা (ফেরত) নিতে চাচ্ছ? তোমরা তা কিভাবে (ফেরত) নিতে

পার, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়েছ (সহবাস করেছ) আর তারাও তোমাদের কাছ থেকে শক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।"[সূরা নিসা ৪: ২০-২১]

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন: অর্থাৎ কেউ যদি তার কোন স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে তার স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন প্রথম স্ত্রীকে যে মোহরানা দিয়েছিল সেটা ফেরত না নেয়। এমনকি তার প্রদেয় মোহরানা যদি বিপুল সম্পদ হয়ে থাকে তবুও। মোহরানা পরিশোধ করা হয় যৌনাঙ্গের বিপরীতে (অর্থাৎ যা দিয়ে যৌনাঙ্গকে হালাল করা হয়েছে)। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: " অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়েছ"। আর "শক্ত অঙ্গীকার" হল বিয়ের চুক্তি।
আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণিত আছে যে, আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) একবার রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। তখন তার মাঝে (জাফরানের) হলুদ রঙ দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল: আমি এক আনসারী নারীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন: তুমি তাকে কত মোহরানা দিয়েছে? জবাবে সে বলল: এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি একটি ভেড়া দিয়ে হলেও ওয়ালিমা কর।"[সহিহ বুখারী (৪৭৫৬)]

মোহরানা হচ্ছে কনের প্রাপ্য অধিকার। কনের বাবা কিংবা অন্য কারো জন্য এটি গ্রহণ করা জায়েয নয়; যদি না কনে সন্তুষ্ট চিত্তে তাদেরকে প্রদান না করে।

আবু সালেহ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথা ছিল যখন কোন লোক তার মেয়েকে বিয়ে দিত তখন মেয়ের পরিবর্তে সে নিজেই মোহরানার অর্থ গ্রহণ করত। আল্লাহ্ সেটাকে নিষেধ করে নাযিল করেন:

وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورة النساء

"তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে/ফরয জেনে/ নারীদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান কর।"[সূরা নিসা, আয়াত: ৪]

অনুরূপভাবে নারী যদি তার স্বামীকে মোহরানার কোন অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে স্বামীর জন্য সেটা গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"তবে তারা যদি খুশিমনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খেতে (ভোগ করতে) পার।"

[সূরা নিসা ৪: ৪]

ইজাব কবুল:

ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ)। এটি বিয়ের অন্যতম রুকন। কারণ এর মাধ্যমেই একজন পুরুষের সাথে আরেকজন নারীর সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে উভয়ের সম্মতি শর্ত। বর-কনে যে কোন একজনের পক্ষ থেকে প্রথমে বিয়ের সম্মতিসূচক যে উক্তি বের হয় তা হানাফীদের মতে ইজাব। তার পরে অন্য জনের পক্ষ থেকে যে উক্তি বের হয় তা কবুল। যেমন কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে বলে, তুমি আমার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হও। তখন মহিলা বলল, আমি (এই প্রস্তাব) গ্রহণ করলাম। তাহলে হানাফীদের মতে প্রথমটি হবে ইজাব (প্রস্তাব) আর দ্বিতীয়টি হবে কুবল (গ্রহণ)। তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, মেয়ের অভিভাবকের কথা হবে ইজাব বা প্রস্তাব। আর বরের কথা হবে কবুল।

স্বামী - স্ত্রীর কর্তব্য :

১- বৈধ কর্মে ও আদেশে স্বামীর আনুগত্য। স্বামী সংসারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সংসার ও দাম্পত্য বিষয়ে তার আনুগত্য স্ত্রীর জন্য জরুরী।স্ত্রী সাধারণতঃ স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট হয়। মাতৃলয়ে মা-বাপের (বৈধ বিষয়ে) আদেশ যেমন মেনে চলতে ছেলে-মেয়ে বাধ্য, তেমনি শ্বশুরালয়ে স্বামীর আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলাও স্ত্রীর প্রকৃতিগত আচরণ। তাছাড়া ধর্মেও রয়েছে স্বামীর জন্য অতিরিক্ত মর্যাদাতবে অন্যায় ও অবৈধ বিষয়ে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্য অবৈধ। কারণ যাদেরকে আল্লাহ কর্তৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে অবৈধ ও অন্যায় কর্তৃত্ব দেননি।

যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও পতিব্রতা সে নারীর বড় মর্যাদা রয়েছে ইসলামে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

"রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।

স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা বিরাট। এই মর্যাদার কথা ইসলাম নিজে ঘোষণা করেছে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, “স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।”[3]

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

“যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।”

(তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৫নং)

২- স্বামীর মান-মর্যাদা ও চাহিদার খেয়াল রাখা স্ত্রীর জন্য জরুরী। স্বামী বাইরে থেকে এসে যেন অপ্রীতিকর কিছু দেখতে, শুনতে, শুঁকতে বা অনুভব করতে না পারে। পুরুষ বাইরে কর্মব্যস্ততায় জবলে-পুড়ে বাড়িতে এসে যদি স্ত্রীর স্মিতমুখ ও দেহ-সংসারের পারিপাট্য না পেল, তাহলে তার আর সুখ কোথায়? সে নারী কত আদর্শ পতিভক্ত, যে তার স্বামীকে মিলন দিয়ে খুশী ও সন্তুষ্ট করার জন্য কারো মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করে না। অতি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এমনটি করা অনুপম পতিভক্তির পরিচয়।

৩- স্বামীর দ্বীন ও ইজ্জতের খেয়াল করা ওয়াজিব।স্বামীর অবর্তমানে কোন বেগানার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে অথবা কোথাও গেয়ে-এসে নিজের তথা স্বামীর বদনাম করা এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা মোটেই বৈধ নয়। স্বামী-গৃহে হিফাযতের সাথে থেকে তার মন মতো চলা এক আমানত। এই আমানতের খেয়ানত স্বামীর অবর্তমানে করলে নিশ্চয়ই সে সাধবী নারী নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾

“সুতরাং সাধবী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে।”। (সূরা আন-নিসা (৪) : ৩৪)

৪- স্বামীর বৈয়াক্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। সুতরাং তার ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, পড়াশুনা প্রভৃতিতে ডিস্টার্ব করা বা বাধা দেওয়া হিতাকাঙিক্ষনী স্ত্রীর অভ্যাস হতে পারে না। স্বামীর নিকট এমন বিষয়, বস্ত্ত বা বিলাস-সামগ্রী স্ত্রী চাইবে না, যার ফলে সে বাধ্য হয়ে অবৈধ অর্থোপার্জনের পথ অবলম্বন করে ফেলে। হারাম উপার্জন ও অসৎ ব্যবসায় মোটেই তার সহায়তা করবে না। সাধবী স্ত্রী তো সেই; যে তার স্বামীকে ব্যবসায় বের হলে এই বলে সলফের স্ত্রীর মত অসিয়ত করে, ''আল্লাহকে ভয় করবেন, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকবেন। কারণ, আমরা না খেয়ে ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারব; কিন্তু জাহান্নামে ধৈর্য ধরতে পারব না!''

(আল মারআতুল মুসলিমাহ, ওয়াহবী সুলাইমান আল-আলবানী ১৬৯পৃঃ, সিফাতুল মু'মিনাতিস সা-দিক্বাহ, নাওয়াল বিন্ত্ আব্দুল্লাহ ৫০-৫১পৃঃ)

৫- স্বামীর ঘর সংসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর যাবতীয় খিদমত করা, ছেলে-মেয়েদেরকে পরিষ্কার ও সভ্য করে রাখাও তার দায়িত্ব। সর্বকাজ নিজের হাতে করাই উত্তম। এতে তার স্বাস্থ্য ভালো এবং দেহে স্ফূর্তি থাকবে। একান্ত চাপ ও প্রয়োজন না হলে দাসী ব্যবহার আলসে মেয়ের কাজ। সাহাবী মহিলাগণ সবহস্তে ক্ষেতেরও কাজ করতেন। একদা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কাজের চাপের এবং নিজের মেহনত ও কষ্টের কথা আব্বার নিকট উল্লেখ ক'রে কোন খাদেম চাইলে প্রিয় নবী (ﷺ) তাঁকে সবহস্তে কর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিলেন এবং অলসতা কাটিয়ে উঠার ঔষধও বলে দিলেন; বললেন, ''যখন তোমরা শয়ন করবে তখন ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার' ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেম থেকেও উত্তম হবে!''

(মুসলিম ২৭২৭নং)

৬- স্বামী তার স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে থাকে। যথাসাধ্য উত্তম আহার-বসনের ব্যবস্থা করে থাকে। তবুও ত্রুটি স্বাভাবিক। কিন্তু সামান্য ত্রুটি দেখে সমস্ত উপকার, উপহার ও প্রীতি-ভালোবাসাকে ভুলে যাওয়া নারীর সহজাত প্রকৃতি। কিছু শিক্ষা বা শাসনের কথা বললে মনে করে, স্বামী তাকে কোনদিন ভালোবাসে না। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়ে থাকে। এটি এমন একটি কর্ম যার জন্যও মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামবাসিনী হবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ ১৯ নং)

৭- স্ত্রী হয় সংসারের রানী। স্বামীর ধন-সম্পদ সর্বসংসার হয় তার রাজত্ব এবং স্বামীর আমানতও। তাই তার যথার্থ হিফাযত করা এবং যথাস্থানে সঠিকভাবে তা ব্যয় করা স্ত্রীর কর্তব্য। অন্যায়ভাবে গোপনে ব্যয় করা, তার বিনা অনুমতিতে দান করা বা আত্মীয়-স্বজনকে উপঢৌকন দেওয়া আমানতের খেয়ানত।

৮- স্বামীর অনুমতি না হলে তার উপস্থিতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারে না। যেহেতু তার সাংসারিক কর্মে বা যৌন-সুখে বাধা পড়লে আল্লাহ সে রোযায় রাযী নন।

(বুখারী, মুসলিম, সহীহ আত্তারগীব অত্তারহীব ৯২৭নং)

৯- কোন বিষয়ে স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রী বিনীতা হয়ে নীরব থাকবে। নচেৎ ইঁটের বদলে পাটকেল ছুঁড়লে আগুনে পেট্রল পড়বে। যে সোহাগ করে, তার শাসন করার অধিকার আছে। আর এ শাসন স্ত্রী ঘাড় পেতে মেনে নিতে বাধ্য হবে। ভুল হলে ক্ষমা চাইবে। যেহেতু স্বামী বয়সে ও মর্যাদায় বড়। ক্ষমা প্রার্থনায় অপমান নয়; বরং মানুষের মান বর্ধমান হয়; ইহকালে এবং পরকালেও।

১০- স্বামীর সংসারে তার পিতামাতা ও বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। স্বামীর মা-বাপ ও বোনকে নিজের মা-বাপ ও বোন ধারণা করে সংসারের প্রত্যেক কাজ তাদের পরামর্শ নিয়ে করা, যথাসাধ্য তাদের খিদমত করা এবং তাদের (বৈধ) আদেশ-নিষেধ মেনে চলা পুণ্যময়ী সাধবী নারীর কর্তব্য।

পরিবারে স্বামীর ও কর্তব্য রয়েছে

সুখী সংসার গঠনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বিশেষ করণীয় আছে। কিন্তু পরিবারের দায়িত্বশীল হিসেবে এ ক্ষেত্রে স্বামীর দায়িত্ব বেশি। একটি সুখী পরিবার গড়তে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১-স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। কেননা সে তার স্বজন ছেড়ে শুধু স্বামীর কাছে আসে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, (তবে হতে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।

’ (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৯)

২-অবসরে স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে বসে কিছু গল্পগুজব করা, তার মনের কথা জানা-বোঝা, তার কোনো চাহিদা থাকলে তা জেনে নিয়ে পূরণ করা স্বামীর জন্য জরুরি। আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) যখন (ফজরের সুন্নত) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি জাগ্রত হলে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন। অন্যথায় তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন এবং ফজরের সালাতের জন্য মুয়াজ্জিন না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন। (বুখারি, হাদিস : ১১৬১)

৩-স্বামীদের করণীয় হচ্ছে নিজেকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা।

কেননা অপরিচ্ছন্ন থাকা ও অপরিষ্কার পোশাক পরিধান করা স্ত্রীরা পছন্দ করে না। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, ‘আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হতে এমন পছন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পছন্দ করি। ’ (তাফসির কুরতুবি : ৫/৯৭)

৪-সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। সে জন্য বাড়ি থেকে বের হতে ও বাড়িতে প্রবেশকালে বাড়ির অধিবাসী বিশেষত স্ত্রীকে সালাম দিতে হবে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায় থাকে।

যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে রিজিকপ্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহর জিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশে বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায়। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৯৪)

৫-স্ত্রী অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হলে সাধ্যমতো তার সেবা করা স্বামীর কর্তব্য। ইবন ওমর (রা.) বলেন, ওসমান (রা.) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর কন্যা অসুস্থ ছিলেন। তখন নবী করিম (সা.) তাঁকে বলেন, বদর যুদ্ধে

যোগদানকারীর সমপরিমাণ সওয়াব ও (গনিমতের) অংশ তুমি পাবে। (বুখারি, হাদিস : ৩১৩০)

৬-স্ত্রীকে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা স্বামীর জন্য একান্ত করণীয়। বিশেষত সে অসুস্থ হলে বা তার পক্ষে কোনো কাজ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে তাকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করা জরুরি। আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন সালাতের সময় হতো তখন তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন। (বুখারি, হাদিস : ৬৭৬)

৭-অনেকে স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। তাই সন্দেহ করা ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান পাপ।'
(সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১২)

৮-স্বামীর ওপর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা। রাসুল (সা.) বলেন, তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে; তোমার ওপর তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। (বুখারি, হাদিস : ১৯৭৫, ৫১৯৯)

৯-স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাধ্যমে একটি সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে কারো অবদান কম নয়। কাউকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্বামী বাইরের কাজ করে আর স্ত্রী বাড়ির ভেতরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই পরিবারের যেকোনো কাজে তার সঙ্গে পরামর্শ করা ও সঠিক হলে সে পরামর্শ মূল্যায়ন করা উচিত। আল্লাহ বলেন, 'আর জরুরি বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। ' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯)

রাসুল (সা.) অহি নাজিলের পরে খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। (বুখারি, হাদিস : ৪৯৫৩)

১০-স্ত্রীকে তার মা-বাবা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া উচিত। আর এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নিজে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বা মাহরাম ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়ে পাঠাতে হবে। ইফকের ঘটনাকালে আয়েশা (রা.) অসুস্থ হলে তিনি পিতার বাড়িতে গমনের জন্য রাসুল (সা.)-এর কাছে অনুমতি চান। রাসুল (সা.) তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান। (বুখারি, হাদিস : ২৬৬১)

সন্তান লালন পালন :

সন্তানের উত্তম লালন পালনের দায়িত্বটি পিতা মাতার ওপর বড় একটি আমানত। এটি এমন একটি আমানত যার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। প্রতিটি পদে পদে তাদের খেয়াল রাখতে হবে কারণ সন্তানেরা কাদা মাটির মত মা বাবা ছোট থেকে তাদের যেমন ভাবে গড়ে তুলবে যেভাবে তাদের তরবিয়ত করবে তারা পরবর্তীতে তেমনভাবে গড়ে উঠবে। কারণ এই সন্তানেরাই উম্মতের কর্ণধার। তাই তারা যেন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে উম্মাহর নেতৃত্বের হক পরিপূর্ণ আদায় করতে পারে সেজন্য তাদের উত্তমভাবে প্রতিপালন করতে হবে।। তাদের শারীরিক ও আত্মিকভাবে সামর্থ্যবান বানাতে হবে। তাদের মধ্য থেকেই একদিন বেরিয়ে আসবে নতুন এক উম্মাহর দিশারী।

সন্তানকে আল্লাহর নির্ধারিত নীতির ওপর গড়ে তোলা সকল মুসলমান মা-বাবার উপর ফরজ। সন্তানকে শিশু কাল হতেই শিরক মুক্ত ঈমান ও তাওহীদ শিক্ষা দেওয়া, পাপাচারিতা ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে দূরে রাখা এবং তাদের ইসলাম আদর্শে গড়ে তোলা , যাতে তাদের মাঝে সুস্থতা ও পবিত্রতার সমীকরণ প্রবাহমান থাকে এবং তারা অন্যকে প্রাধান্য দান ও ধৈর্য ধারণ করার মতো মহৎ গুনে গুণান্বিত হতে পারে।

কারোর সন্তানদের মন্দ প্রতিপালনের কারণে পিতা-মাতাকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর"

(সূরা আত তাহরিম-আয়াত :৬)

পিতা-মাতার হক :

পিতা-মাতা সন্তানকে লালন-পালন করে বড় করে তোলে। সে কারণে ইসলাম পরিবারের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে।

বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদেরকে সম্মান করা এবং তাদের আনুগত্য করা সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন ্তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো।'' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩)।

"আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।''

(সূরা লুকমান, আয়াত ১৪)।

তবে পিতা-মাতা যদি অন্যায় কাজের আদেশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দীয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, সময়মত নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, তারপর কোন কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি তার আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক, সে যেন তার বাবা-মার সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।''

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা যেমন সন্তানের কর্তব্য, তেমনি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা কবীরা গুনাহ।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

বর্তমান সময়ের দমবন্ধ হয়ে আসা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমরা সবাই একমত যে আমাদের সমাজের যে অবস্থা তাকে কোনোভাবেই সুস্থ অবস্থা বলা চলে না। প্রতিদিনের পত্রিকায় যে পরিমাণ নির্যাতন, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, মাস্তানি, দুর্নীতি, প্রতারণা, কেলেঙ্কারী ইত্যাদির খবর প্রকাশিত হয় তা আমাদের সমাজের মারাত্মক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরার জন্য যথেষ্ঠ। যদিওবা বিভিন্ন ব্যক্তি এসব ঘটনার সাথে জড়িত, তথাপি এগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। এগুলো এখন ব্যাপকতর পরিসরে ঘটমান দৈনন্দিন ঘটনা- তাই এগুলোকে আমাদের সামাজিক সমস্যা হিসেবেই চিহ্নিত করা উচিৎ।

সমাজ কিঃ

পশ্চিমা সভ্যতা জীবনের সব বিষয়কে হালকাভাবে দেখে তাই সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও অগভীর হওয়াই স্বাভাবিক। তারা সমাজকে শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিমানুষের সমষ্টি বলেই মনে করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মার্গারেট থ্যাচার একবার এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় বলেছিলেন, "সমাজ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কিছু ব্যক্তি ও পরিবারের সমষ্টি মাত্র।"

বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা চলছে তা পুরোটা পশ্চিমা ভিত্তি। সেখানে ইসলামের কোন ছিটে ফোটাও নেই।

তার ফল হিসেবে সমাজে নানা রকম অরাজকতা ,হিংস্রতা, মারামারি , ছিনতাই নানা ধরনের অসামাজিক কাজ বেড়েই চলেছে। পশ্চিমা সভ্যতা কখনোই একটি সুষ্ঠ সমাজ গঠনে শিক্ষা দেয় না মুসলিম উম্মাহ্ অধঃপতনের এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক সৎ সংস্কারক ও অনেক সাহসী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা আন্তরিকভাবেই উম্মাহ্ এই খারাপ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন বা করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়েছেন- অর্থাৎ তারাও মনে করেছেন সমাজ হলো আসলে অনেকগুলো ব্যক্তি। তাই তাঁরা চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিকে ভাল মুসলমানে পরিণত করতে; তাকে ভাল আদব কায়দা, ধর্মীয় রীতি নীতি শেখাতে এবং চিন্তা করেছেন যে অনেকগুলো ব্যক্তি যখন ভাল হয়ে যাবে তখন সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। যদিও তাদের

আন্তরিক চেষ্টার ফলে অনেক মানুষ সে সব আন্দোলন ও কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো সমাজের বাস্তব অবস্থা অর্থাৎ সমাজে বিদ্যমান অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা, বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ইত্যাদির তো কোনও পরিবর্তনই হয়নি বরং এগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

উত্তম সমাজ :

মানব সমাজ মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একদল আল্লাহকে স্বীকার করে ও তাঁর বিধান মেনে চলে। আরেক দল নিজেদের সীমিত জ্ঞান তথা প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের পূজা করে ও যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলে। উভয় দল পৃথকভাবে বা একত্রিতভাবে সমাজে বসবাস করে। উভয় দলের মধ্যেই রয়েছে কট্টরপন্থী, মধ্যপন্থী ও শৈথিল্যবাদী। সবাইকে নিয়েই সমাজ। আর সমাজ নিয়েই মানুষ। প্রত্যেকে একে অপরের মুখাপেক্ষী। তাই সমাজ গঠনের ও তা পরিচালনার জন্য মানুষকে সর্বদা উচ্চতর জ্ঞানী ও শক্তিমানের অনুসারী হ'তে হয়। আর এটা আল্লাহরই চিরন্তন ব্যবস্থাপনা। যখন কোন সমাজ ও সমাজ নেতা আল্লাহর দাসত্ব করে ও তাঁর বিধান মতে চলে, তখন সেই সমাজ হয় উত্তম সমাজ। আর যখন তার বিপরীত হয়, তখন সেটি হয় নিকৃষ্ট ও শয়তানী সমাজ। তবে যেকোন সমাজে যেকোন সময় একই ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব ও শয়তানের দাসত্ব দু'টিই করতে পারে। সমাজের দায়িত্ব হবে তখন শয়তানী তৎপরতাকে রুখে দেওয়া ও মানবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। এভাবে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে উত্তম সমাজ গঠিত হবে। আর উত্তম সমাজ কাঠামোর মধ্যেই উত্তম ব্যক্তি ও পরিবার গড়ে ওঠা সহজ হয়। সমাজের বৃহত্তম রূপ হ'ল রাষ্ট্র। আর রাষ্ট্র সমূহের ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর রূপ হ'ল বিশ্বরাষ্ট্র। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র সবই উত্তম হবে যদি উত্তম নীতিমালা ও উত্তম ব্যক্তি সমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়। আর যদি অনুত্তম নীতিমালা ও অনুত্তম ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা তা পরিচালিত হয়, তবে সেই পরিবার ও সমাজ নষ্ট সমাজে পরিণত হবে। ঐ রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্রে পর্যবসিত হবে। যেমন বর্তমান শতাব্দীতে অধিকাংশ রাষ্ট্র কার্যতঃ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

এখানে সমাজকে গুরুত্ব দিচ্ছি একারণে যে, রাষ্ট্র বলি বা বিশ্বরাষ্ট্র বলি, সমাজই তার ভিত্তি। সমাজ যে আক্বীদা-বিশ্বাস ও রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হবে, রাষ্ট্র সেভাবে পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। কিন্তু এ রাষ্ট্র ইসলামী নীতিতে পরিচালিত হয় না। এর কারণ এখানকার মুসলিম সমাজের অধিকাংশ নেতা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। আবার আলেমগণ ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদত সমূহের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে শত দলে বিভক্ত এবং অনেকে যিদ ও অহংকারে অন্ধ। সেই সাথে সমাজও বিভক্ত। ইসলামের মূল তাওহীদী

রূহ, যা পরস্পরকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখে, তা শিথিল হ'তে হ'তে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন মুসলমানেরা তাওহীদের উপরে কুফরীকে স্থান দিচ্ছে। ফলে এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে শয়তান। সে তার যাবতীয় উপায়-উপাদান নিয়ে জান্নাতের রাস্তায় প্রতিরোধ বসিয়েছে আছহাবুল উখদূদের কাহিনীতে রাস্তা বন্ধকারী বিশাল জন্তুটির ন্যায়। শান্তিপ্রিয় অধিকাংশ মানুষ চায় আল্লাহর উপর নিখাদ ভরসাকারী একদল তরুণ ও তাদের পরিচালনাকারী দৃঢ় ঈমানদার নেতা। আমরা একনিষ্ঠ হৃদয়ে চাইলে আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে তা দিবেন। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থেই আমাদেরকে উত্তম সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। আর তা অবশ্যই হ'তে হবে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান অনুযায়ী।

ইসলামী অর্থনীতি

সমাজের বা দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি কিভাবে সম্পন্ন হবে এর জন্য যে সামাজিক ও আইনগত নিয়ম প্রনিত হয় তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থব্যবস্থা বলে।আর ইসলামি অর্থব্যবস্থা হলো-ইসলামে হালাল হারাম,সম্পদের বণ্টন, ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন।

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ, আর মানুষ এর প্রতিনিধি হয়ে তা থেকে তার প্রয়োজন পুরন করে,ইসলামি আইন অনুযায়ী সম্পদের কিছু অংশ দান করে থাকে,এর মাধ্যমে সমাজে শৃংখলা তৈরি হয়।

আল্লাহ বলেন-

"তারা প্রকৃত কল্যাণকর কাজ করল,যারা তাদের ধন সম্পদ আল্লাহর ভালোবাসায় নিকটাত্মীয়,এতিম, মিসকিন, নিঃস্ব,পথিক, দরিদ্র, প্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য দান করল।

ইসলামি অর্থনীতির গুরুত্ব, উদ্দেশ্য এবং সফলতা

ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক, অনুরূপভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক । অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন না হয় এর জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে । গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায়

সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে । এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে । বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনোরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই । মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রে এর বাস্তবতা দেখা যায় । যে আরবের অধিবাসীরা একসময় বৈষম্য ও দারিদ্রের শিকার ছিল, ইসলামি অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যেত না ।

ইসলামিক অর্থনীতির মৌলিক রূপরেখা হলো-

কোরআন ও সুন্নাহর নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
যাকাত,জিজিয়া কর ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ও সুদ,বর্জিত অর্থনীতি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য: ইসলামী অর্থব্যবস্থা এক আদর্শিক অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থা মানব রচিত অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যময়। নিচের আলোচনা হতে তার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

১. ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক পরিচালিত : ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও হাদীস এর মূল উৎস। কুরআন ও হাদীসের নীতিমালার আলোকে কিয়াস দ্বারা এর ব্যবস্থাপনার রীতিনীতি গতিশীল হয়েছে। আর ইজমার মাধ্যমে এ অর্থব্যবস্থার বিধানসমূহ সুদৃঢ় হয়েছে। এ জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থা মূলত ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক ব্যবস্থা।

২. সম্পদের মালিকানা : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহ তাআলার। মানুষ মালিক নয়। বরং আল্লাহর পক্ষে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষক, প্রতিনিধি।

৩. নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা : এ অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানা আছে। তবে তা পুঁজিবাদের মত অবাধ এবং স্বেচ্ছাচারী নয়। আবার সমাজবাদের মত সামষ্টিক মালিকানাও নয়। বরং এ অর্থব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি-মালিকানা।

৪. বণ্টননীতি : এ ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম ও ভারসম্যপূর্ণ বণ্টননীতি অনুসৃত হয়। এখানে কেউ যেমন সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে না, তেমনি কারো পক্ষে নি:স্ব থাকাও সম্ভব না। এ ব্যবস্থায় ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার দেয়া আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তাদের (ধনীদের) সম্পদের প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে, (সূরা জারিয়াহ, ১৯)।

৫. যাকাত ভিত্তিক : ইসলামী অর্থব্যবস্থা যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। এখানে যে মুসলিম ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজনীয় ব্যায়ের পর সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা এর সমপরিমাণ অর্থ পূর্ণ এক বছর অতিরিক্তি থাকে তাকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করেতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, (সূরা বাকারাহ, ৮৩)।

৬. সুদমুক্ত : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সব লেনদেন সুদ-মুক্ত। এ ব্যবস্থায় কোন ক্ষেত্রেই সুদের লেনদেন হালাল রাখা হয়নি। সুদ নিষিদ্ধ করে শোষণের পথ বন্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-আর আল্লাহ তাআলা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন, (সূরা বাকারাহ, ২৭৫)। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদের প্রচলন নেই। রাসূল (সা.) সুদ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আল্লাহর অভিসম্পাত কামনা করেছেন।

৭. উৎপাদন ও উপার্জননীতি : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যা খুশি উৎপাদন করা যায় না, যেভাবে খুশি উপার্জনও করা যায় না। জনস্বাস্থ্য ও স্বাথের্র জন্য হুমকি এমন সব কিছুর উৎপদন ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যবস্থায় আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন এমন কোন কিছুর উৎপাদন বৈধ নয়। উপার্জনের ক্ষেত্রেও হালাল উপার্জন বাধ্যতামূলক। রাসূল (সা.) বলেছেন- হালাল উপার্জন করা ফরজের চেয়েও ফরজ (বায়হাকী, ৮৪৮২)। এজন্য লাভজনক মনে হলেও ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মাদক দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ নেই। সুদ, ঘুষ, চুরি বা সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমেও এ ব্যবস্থায় উপার্জন নিষিদ্ধ।

৮.ব্যয়নীতি : ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যেমন খুশি তেমনভাবে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ নেই। কেবল হালাল পথে ব্যয় করা যাবে। হারাম বস্তু কেনা বা হারাম কাজ সম্পাদনে সম্পদ ব্যয়ের অনুমতি ইসলাম দেয়নি। ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ ব্যয় করবে। অপব্যয় বা অপচয় করা ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-তোমরা খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না, (সূরা আরাফ, ৩১)। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অপচয়-অপব্যয়ের সুযোগ নেই, তেমনি এ ব্যবস্থায় কৃপণতারও অবকাশ নেই।

৯. সঞ্চয়নীতি : প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয়ে ইসলামে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তুলে সঞ্চয় করা কিংবা নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অনটনে রেখে সম্পদ সঞ্চয় করা ইসলামে হালাল মনে করা হয় নি। বরং নিঃস্ব ও দুস্থদের প্রয়োজনে সঞ্চিত সম্পদ দান না করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- যারা সোনা ও রূপা জমাকরে কিন্তু তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণায়ক শাস্তির সংবাদ দিন, (সূরা তাওবা, ৩৪)।

১০. বায়তুলমাল ভিত্তিক : ইসলামী অর্থব্যবস্থা বায়তুলমাল ভিত্তিক। এ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অর্থ প্রশাসন হল বায়তুল মাল। রাষ্ট্রের সব আয় বায়তুল মালে জমা হয়। লোকের দীনি দায়িত্বানুভূতি নিয়ে যাকাতসহ সব অনিবার্য ও ঐচ্ছিক দান বায়তুলমালে জমা দেয়। এ অর্থব্যবস্থায় বায়তুলমাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করে।

মোদ্দাকথা, আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে, মানুষের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চালু করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিকল্প নেই।

ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন

ইসলামী চিন্তার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে তাই ইসলামী জীবন। আর ইসলামিক চিন্তার মূল উৎস হল আল্লাহ ওর রাসূলের দেয়া পথ নির্দেশনা কুরআন হাদিস। ইসলামী জীবন গড়তে হলে আমাদের ইসলামিক চিন্তা চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরামেরা যে সুন্দর ও স্বচ্ছ শান্তিবয়ে ইসলামী জীবনযাপন করে গেছেন মুসলমানেরা সেই জীবনধারাই কামনা করেন। সে জীবন ছিল রাসুলের নিজ হাতে গড়া। সেখানে ছিল না কোন পাপাচার ,মিথ্যাচার , অনৈতিক ও অপকর্ম। একটি সম্পূর্ণ কুফরী ও শিরক সমাজ থেকে উত্তরণ করেছিলেন এক ইসলামী সমাজ। মুছে গিয়েছিল সকল অন্যায় ও জুলুম। এজন্য আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি করেছেন তা আমাদের জানতে হবে ।তার জীবনকে আঁকড়ে ধরতে হবে। তার দেখানো প্রতিটা কাজ যখন আমরা সঠিকভাবে করব এবং তার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবো তখন আমাদের জীবনটা একটা

শান্তিময় জীবন হয়ে উঠবে। ইসলামী জীবন গড়তে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কি কি কাজ করেছেন তা আলোচনা করা হলো

এক . তিনি একটি ভারসাম্য চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন। আকিদা ও বিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এমন একটি চিন্তার রাজ্য বলেছিলেন যে রাজ্যের অধিবাসী ছিল মুসলমান। কোনটি ইসলামী চেতনা ও কোনটি ইসলামিক চেতনা নয়, ইসলামিক দৃষ্টি কোন থেকে কোন কোন বিষয়কে কিভাবে দেখতে হবে এ বিষয়ে তাদের ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। মোটকথা জীবনের চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অনৈসলামী ভাবধারার কোন স্পর্শ ছিলনা।

দুই. তিনি একটি সুদক্ষ ও হক পরস্থ জনবল গড়ে তুলেছিলেন। এই গোষ্ঠীর ন্যায় অন্যায় ছিল খুবই প্রখর।
সত্যকে ধারণ করা ও অসত্যকে বর্জন করাই নয়, দুনিয়ার বুক থেকে তাকে উৎখাত করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই ছিল সিদ্ধ হস্ত। তারা কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেনি এবং অন্যায়কে মাথাচাড়াও দিতে দেয়নি। এ গোষ্ঠীর প্রত্যেক ব্যক্তিই ছিল নিজের জায়গায় মানবিক ইসলামী মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক।

তিন. তিনি একটি আদর্শ সমাজ গঠন করেছিলেন। এই সমাজে মানবের গুণাবলীর পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল। মুহাজির এবং আনসার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন ইসলামের দুটি ডানার ন্যায়। তাদের দ্বারা গঠিত মদিনার সমাজ ছিল একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীক্ষা পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম এমন সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন যে, তারা যে সমাজে বসবাস করেছেন, সে সমাজ হয়ে গেছে আদর্শ সমাজ। তাদের দ্বারা যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে, সে রাষ্ট্র হয়ে গেছে আদর্শ রাষ্ট্র। তাদের পরিবারগুলো ছিল মানবসভ্যতার জন্য আদর্শ পরিবার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের এভাবেই ইসলামের জীবন এবং চিন্তা পরিপূর্ণ হয়। রাসুলুল্লাহ নবুয়াতি শাসন ও খেলাফতী শাসনের পর মুসলিম বিশ্বে যে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয় সেখানেও বর্তমানের রাজতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তখনো রাষ্ট্রের মালিক কোন বাদশা ছিলেন না বরং আল্লাহ ছিলেন। আল্লাহ ও রাসূলের আইনি ছিল সর্বোচ্চ আইন। মুসলিমদের হাজার বছরের রাজতান্ত্রিক শাসন থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বিচ্যুত হলেও ইসলামিক চিন্তা ধারা তখনও মুসলমানদের ছিল। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা ও চিন্তা উত্থান হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের ইসলামিক চিন্তা ও চেতনা ধীরে ধীরে পচন শুরু হয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে পাশ্চাত্য আধিপত্য কিভাবে বিস্তার করেছে তা আমরা জানি। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে নিয়ে বিশ শতকে শুরুর দিকে বেশি সময় ধরে মুসলিম চিন্তার এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। এই বিপর্যয়ের রেশ এখনো রয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন চলছে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। এখন জীবন দর্শন ও চিন্তাদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের চিন্তা দর্শন ও জীবনধারা পুনর্গঠনে সময় এসেছে।

[নোট - ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন এর বই থেকে]

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয় কাজ

মুসলিম জাতি আজ অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত। তবে এই জাতীয় সংকট মুসলিম জাতির ইতিহাসে বারবার সৃষ্টি হয়েছে। হিজরী সপ্তম ও খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাতি এই জাতীয় অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়েছিল। যখন তাতারীরা তুর্কিস্তান, ইরাক ও ইরানে ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ চালিয়ে নগরের পর নগর দেশের পর দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্বকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। তাতারীদের হিংস্রতা ও বর্বরতা বিশ্বব্যাপী মানুষের অন্তরে এরূপ ভীতির সৃষ্টি করেছিল যে, ঐতিহাসিকগণ লেখেন, তাতারীদের আক্রমণস্থল ইরাক, ইরান ও তুর্কিস্তান হতে হাজার হাজার মাইল দূরের ইংল্যান্ডের সাগরপাড়ের জেলেরা তাতারীদের ভয়ে বহুদিন পর্যন্ত মাছ শিকার করতে বের হয়নি। কিন্তু তাতারীদের এই আক্রমণ ছিল নিছক সেনা আক্রমণ। তাদের আক্রমণ ছিল অস্ত্রকেন্দ্রিক। তাদের লক্ষ্য ছিল হত্যা ও দেশ দখল। কোন আদর্শ বিস্তার তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের আক্রমণের পিছনে কোন আদর্শিক

লক্ষ্য কিংবা কোন আদর্শিক আন্দোলন বা দর্শন নিয়ামক হিসাবে কাজ করেনি।তারা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

বিস্তারের লক্ষ্যে তাদের গণহত্যামূলক আক্রমণ পরিচালনা করেনি। ফলে তৎকালীন যুগের কিছু স্বচ্ছ হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতার অধিকারী দ্বীনের একনিষ্ঠ ও প্রভাববিস্তারী মুবাল্লিগ ও দাঈগণের প্রচেষ্টায় তাদের প্রভাবে ও সংস্পর্শে গোটা তাতারী জাতি ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল। শুধু ইসলাম গ্রহণ নয়; বরং এই হিংস্র তাতারী জাতিই পরবর্তীতে ইসলামের বড় সংরক্ষক ও ইসলামী সভ্যতার পতাকাবাহীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বিশালাকারের একাধিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।ইসলাম প্রচারকগণের মাধ্যমে তাতারীরা লাভ করেছিল এক নতুন দ্বীন ও বিশ্বাস। মুসলমানেরা তাদেরকে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সুসংহত ও পরিপূর্ণ সামাজিক ও নাগরিক নিয়মকানুন এবং নতুন নতুন জ্ঞান ও জীবনাচারে পরিপুষ্ট করে এক নতুন জীবনের সন্ধান দান করেছিল। ফলে এদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে এক বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য, যাকে বলা হত উসমানী খেলাফত বা উসমানী সাম্রাজ্য। এই উসমানী খেলাফতই হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামী পবিত্র স্থানসমূহের সংরক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিল এবং ইসলামের মান মর্যাদা ও শান-শওকতের প্রতিভূরূপে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছিল।তবে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম জাতির সংকট পূর্বের যে কোন সংকটের তুলনায় কিছুটা অধিক ভয়াবহ। অজুহাত পেলে তো কথাই নেই নতুবা অজুহাত সৃষ্টি করে হলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে বিশেষত দ্বীনদার শ্রেণীকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে। তদপেক্ষা ভয়াবহ হল, সংবাদপত্রসহ বিশ্বের সকল গণপ্রচারমাধ্যম দ্বারা মুসলমানদের বর্তমান ও নতুন প্রজন্মকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিগতভাবে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের মন মস্তিষ্কে ইসলাম বিরোধী ধ্যান ধারণা ও ইসলাম বিরোধী আকিদা বিশ্বাসের বীজ বপন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় নতুন প্রজন্মকে ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হচ্ছে এবং তাদেরই মাধ্যমে দেশে দেশে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও আক্রোশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিপরীত ধর্মের সকল জাতি গোষ্ঠির কুৎসিত ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ চক্রান্ত মুসলিম জাতিকে আরও বেশী বিপন্ন করে তুলেছে।তবে পরিস্থিতি হতে উত্তরণ এবং সংকট ও শঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আরোপিত বহু শর্তাদি রয়েছে। কুরআন ও হাদীস, নববী

জীবন চরিত্র ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম ও আদর্শের আলোকে কিছু শর্ত পূরণ করা আমাদের জন্য এই মুহূর্তেই জরুরী

এক. এই মুহূর্তে বিশ্বের সকল মুসলমান বিশেষত অপেক্ষাকৃত অধিক সংকটে নিপতিত মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা জরুরী ও কর্তব্য বিষয় হল, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ, রুজু ইলাল্লাহ তথা একান্তভাবে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া, তাওবা ও ইস্তিগফার করা, দুআ করা ও কাকুতি মিনতি সহকারে কান্নাকাটি করা।

দুই. দ্বিতীয় শর্ত এবং জরুরী ও ত্বরিৎ পদক্ষেপের বিষয় হল তাকওয়া অবলম্বন, গুনাহ পরিহার, গুনাহ হতে আত্মরক্ষা করে চলা। কোন গুনাহকেই সাধারণ ও তুচ্ছ গণ্য না করা।

এক্ষেত্রে হযরত উমার ইবনে আবদুল আজীজ (রাহ.) এর একটি চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর এক সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানের উদ্দেশ্যে। তিনি লিখেছিলেন,

আল্লাহর বান্দাহ উমর ইবনে আবদুল আজীজ এর পক্ষ হতে মানসূর ইবনে গালেবের নামে

তোমরা সর্বদা তাকওয়ার উপর অবিচল থাকবে। কেননা তাকওয়া ও আল্লাহভীতিই সর্বোত্তম পাথেয় ও উপকরণ, অধিক কার্যকর কৌশল এবং প্রকৃত শক্তি। সেনাপ্রধান নিজে এবং তার অধীনস্থ সৈনিকেরা যেন শত্রু অপেক্ষা গুনাহকে অধিক ভয় করে। কেননা, শত্রুদের কৌশল, তাদের শক্তি ও আক্রমণ অপেক্ষা গুনাহ অধিক ভয়াবহ। আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করি তাদের গুনাহর কারণে। তাদের গুনাহ না থাকলে আমরা তাদের সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠতাম না। কারণ আমাদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশক্তি তাদের তুলনায় কম। গুনাহকর্মে যদি আমরা তাদের সমপর্যায়ের হয়ে যাই তাহলে অস্ত্রশক্তি ও সৈন্যসংখ্যায় তারা আমাদের তুলনায় অগ্রগামী থাকবে। দুশমন অপেক্ষা নিজের গুনাহর ব্যাপারে অধিক সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যতদূর সম্ভব

অন্য সবকিছু অপেক্ষা নিজের গুনাহর ব্যাপারে অধিক চিন্তিত থাকা উচিৎ।-সীরাতে উমার বিন আবদুল আজীজ, আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম (সংক্ষেপিত)

তিন. আরেকটি জরুরী বিষয় হল, মুসলিম জনসাধারণকে ঈমান বিধ্বংসী ফিতনা সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা। তাওহীদ ও ঈমানের সঙ্গে তাদেরকে যথার্থরূপে পরিচিত করে তোলা। কুফর কী, কুফরের ভয়াবহ পরিণাম কী সে সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক ধারণা দেওয়া। মসজিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে গভীর করে তোলা। আলেম উলামার- সংসর্গ অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা। এর জন্য দাওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রমের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করাসহ নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে সাধারণ দ্বীনদার শ্রেণী ও আমাদের যে দায়িত্ব ছিল তিক্ত হলেও সত্য যে, সেই দায়িত্ব পালনে সীমাহীন অবহেলা ও ত্রুটি হয়েছে। পরিণামে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সীমাহীন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

চার. আরও অনেক জরুরী বিষয়ের মধ্য হতে এই ছোট্ট লেখায় উল্লেখ করার মত সর্বশেষ জরুরী বিষয় হল, আমাদের নতুন প্রজন্মকে দ্বীনের জরুরী বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা। দ্বীনী ফরযসমূহ ও ইসলামী নীতি, চরিত্র ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করা। দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা। তাদের মন ও মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল করে দেওয়া যে, মানবজীবনের জন্য কল্যাণকর আদর্শ একমাত্র ইসলামী আদর্শ, ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোন আদর্শের শ্লোগান-তা যতই চিত্তাকর্ষক হোক, ফাঁকা বুলিসর্বস্ব বৈ কিছু নয়। আর এই দায়িত্ব প্রথমত প্রতিটি পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সন্তান-সন্ততির পিতামাতাকেই গ্রহণ করতে হবে। এবং এটাকে চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণের ন্যায় অপরিহার্য দায়িত্ব বলে মনে করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

মুমিনগণ, তোমরা রক্ষা কর নিজেরদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

হাদীসে এসেছে-

তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল ও শাসকের মর্যাদা রাখ। অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামকেও এগিয়ে আসতে হবে। জনগণকে সচেতন করণ, পাড়া-মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠা করণসহ স্থান ও কাল উপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উলামায়ে কেরাম যদি তাদের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত করেন তাহলে তাঁরা নিজেরাও নিরাপদ হবেন, দেশও নিরাপদ হবে।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, মাত্রাতিরিক্ত আবেগতাড়িত হয়ে খন্ডকালীন ও তৎক্ষণাৎ কর্মসূচীর অপেক্ষা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

(হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর একটি ভাষণ অবলম্বনে)